

লজ্জা

তসলি মা নাসরিন



১

সুরঞ্জন শয়ে আছে, মায়া এসে বারবার তাড়া দিচ্ছে দাদা ওঠ, কিছু একটা ব্যবস্থা কর। সুরঞ্জন জানে এই ব্যবস্থার নাম কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকা। ইন্দুর যেমন গর্তে ঢোকে ভয়ে, ভয় কেটে গেলে বা পরিস্থিতি শাত হলে চারদিক দেখেশুনে লুকোনো জায়গা থেকে ইন্দুর যেমন বেরিয়ে আসে, তেমনি বেরিয়ে আসতে হবে তাদের। কেন তাকে নিজের ঘর ছেড়ে পালাতে হবে - তার নাম সুরঞ্জন দত্ত, তার বাবার নাম সুধাময় দত্ত, মায়ের নাম কিরণময়ী দত্ত, বোনের নাম নীলাঞ্জনা দত্ত, শুধু এই কারণে? এই কারণে তাকে আজ আলতাফ, কামাল বা লতিফের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হবে, যেমন নিয়েছিল দুবছর আগে? না, সুরঞ্জন এবার যাবে না। বাবা মা শুক্র হয়ে বসে আছেন ঘরে, মায়া ছুটোছুটি করছে একবার বাবা মার ঘরে, একবার সুরঞ্জনের ঘরে। মায়া বোঝাতে চেষ্টা করছে কিছু একটা ঘটে যেতে পারে, আর দ্যর্ঘনা ঘটে গেলে পরে দৃঢ় করে লাভ নেই। দু'বছর আগে কামাল এসেছিল নিতে, বালছিল বাড়িতে তালা দিয়ে সবাই আমার বাড়ি চল। কামালের চোখেমুখে ছিল উদ্বেগ, তাড়া দিছিল- চল চল দেরি করিস নে। কামাল তার অনেকদিনের বন্ধু। তবু আচ্ছায়াজন নিয়ে কামালের বাড়িতে আশ্রয় কেন তাকে নিতে হয়! কামালকে তো ঘর ছেড়ে পালাতে হয় না, সুরঞ্জনকে কেন পালাতে হয়। এই দেশ কামালের যতটুকু, সুরঞ্জনেরও ঠিক ততটুকু। নাগরিক অধিকার দুর্জনের সমান হবারই কথা, অথচ সুরঞ্জন বোঝে কামালের মত সে উদ্ভিত দাঁড়াতে পারে না, সে দাবি করতে পারে না আমি এই মাটির সস্তান, আমার যেন কোনও অনিষ্ট না হয়।

আজ ডিসেম্বরের সাত তারিখ। গতকাল দুপুরে অযোধ্যায় সরবূ নদীর তীরে নেনে আসে ঘোর অঙ্ককর। করসেবকরা সাড়ে চারশ' বছরের পুরোনো একটি মসজিদ ভেঙে ফেলেছে। বিশ্বহিন্দু পরিষদের ঘোষিত করসেবা শুরুর পঁচিশ মিনিট আগে ঘটনাটি ঘটে। করসেবকরা প্রায় পাঁচ ঘটনাটার চেষ্টায় তিনিটি গম্বুজসহ সম্পূর্ণ সৌধটিকে ধ্বলোয় মিশিয়ে দেয়। পুরো ঘটনাই ঘটে বিজেপি, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, আর এস এস, বজরং দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী, পি.এসি ও উত্তরপ্রদেশ পুলিশ নিক্রিয় দাঁড়িয়ে করসেবকদের অবিশ্বাস্য অপকাও দেখে। দুপুর দুটো পঁয়তাঙ্গিশ মিনিটে একটি গম্বুজ ভাঙ্গ হয়, সাড়ে চারটায় দ্বিতীয় গম্বুজ, চারটে পঁয়তাঙ্গিশে তৃতীয় গম্বুজও ভেঙে ফেলে উন্মুক্ত করসেবকরা। সৌধ ভাঙ্গতে গিয়ে চারজন করসেবক ধ্বংসস্তুপের নিচে চাপা পড়ে নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে শতাধিক।

সুরঞ্জন শয়ে শয়েই পত্রিকার পাতায় চোখ বুলোয়। আজ ব্যানার হেড়িং- বাবরি মসজিদ ধ্বংস, বিধব্রত। বাবির মসজিদ দেখেন সুরঞ্জন, দেখবে কী, সুরঞ্জন অযোধ্যায় যায়নি কোনও দিন, দেশের বাইরে কোথাও যাওয়া হয়নি তার। সুরঞ্জন এটা মানে, ঘোড়শ শতাধির এই স্থাপত্য কাজে আঘাত করা মানে এ কেবল ভারতীয় পুনৰ্জনানকে আঘাত

করা নয়, সমগ্র হিন্দুর ওপরও আঘাত, আসলে এ পুরো ভারতের ওপরই আঘাত, সমগ্র কল্যাণবোধের ওপর, সমবেত বিবেকের ওপর আঘাত।

কিন্তু এ কথা কাকে বোঝাবে? মায়া বলছে দাদা কিছু একটা ব্যবহাৰ কৰ। সুধাময়ের ঘৰে টেলিভিশন খোলা, ওৱা নি এন এন দেখছে। সি এন এন অযোধ্যায় বাবৰি মসজিদ ভেঙে ফেলবাৰ দৃশ্য দেখাচ্ছে। তা দেখুক ওৱা, সুৱজন দেখবে না। সুৱজন আজ কোথাও যাবে না। সুৱজন বুৱতে পাৱছে এ দেশে ও বাবৰি মসজিদ নিয়ে শুৰু হয়ে গোছে প্ৰচণ্ড তাওৰ, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানেৰ মন্দিৱগুলো ধূলিসাৎ হয়ে যাবে, সংখ্যালঘু হিন্দুদেৱ ঘৰবাড়ি পুড়বে, দেকানপাটি লুঠ হবে। বিজেপিৰ উক্তানিতে কৱসেবকাৰা বাবৰি মসজিদ ভেঙে এসব দেশৰ মৌলবাদি দলকে আৱও হষ্টপুষ্ট কৱেছে। বিশ্বহিন্দু পৰিষদ, বিজেপি এবং তাদেৱ সহযোগিৱা কি তাদেৱ উন্নত আচৰণেৰ জেৱ কেবল ভাৱতেৰ ভোগোলিক সীমাবেষ মধ্যে আবক্ষ থাকবে ভেবেছে? ভাৱতে শুৰু হয়ে গোছে প্ৰচণ্ড সাম্প্ৰদায়িক দাপ্তাৰ। মৰছে পাঁচশ ছশ একহাজাৰ। ঘন্টায় ঘন্টায় মৃত্যুৰ সংখ্যা বাড়ছে। হিন্দুৰ স্বার্থৰক্ষকৰা কি জানে না যে অস্তত দুকোটি হিন্দু এই বাংলাদেশে আছে? শুধু বাংলাদেশে কেন, পশ্চিম এশিয়াৰ প্ৰায় প্ৰতিটি দেশে হিন্দু রয়েছে, তাদেৱ কী দুর্দশা হবে হিন্দু মৌলবাদিৱা একবাৰ ভেবেছে? রাজনৈতিক দল হিসেবে ভাৱতীয় জনতা পাটিৰ জানা উচিত ভাৱত কোনও বিজিত্বা ভাস্তুৰ নয়। ভাৱতে যদি বিষয়কোঢ়াৰ জন্ম হয় তাৰ যদ্রণা শুধু ভাৱতই তোগ কৱে৬না, যদ্রণা ছড়িয়ে পড়ছে সমগ্র বিশ্বে অস্তত প্ৰতিবেশি দেশগুলোৰ তো সৰাৰ আগে।

সুৱজন এই বাংলাদেশৰ মানুষ। ডাঃ সুধাময় দত্তেৰ জ্যোষ্ঠ সন্তান শ্ৰী সুৱজন দন্ত কুল কলেজৰ মেধাবী ছাত্ৰ, পদাৰ্থ বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তৰ ডিপ্লি নিয়ে ঘৰে বসে আছে, স্নেফ ঘৰে বসে থাকা বলতে যা বোঝাবা সুৱজন তাই কৱেছে। দুএকটি ফাৰ্মেৰ্স কাজ কৱেও ছেড়ে দিয়েছে, ভাল লাগেনি। ইচ্ছে ছিল পি এইচ ডি কৱে৬, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক হবে, সে ইচ্ছেও নষ্ট হয়ে গোছে। তাৰ আৱ সুখ-সচলতাৰ স্থপু দেখতে ইচ্ছে কৱে না। সুৱজন তাৰ বাবাৰ মধ্যেও এই যদ্রণা দেখেছে, তিনি ছিলেন মেডিকেল কলেজৰ এসিস্ট্যান্ট প্ৰফেসৱ, এসোসিয়েট প্ৰফেসৱ হবাৰ তাৰ বড় ইচ্ছে ছিল, সম্ভ হয়নি। পদোন্নতি হয়েছে সফিউন্ডেনেৱ, সালাম তালুকদারেৱ, কেবল সুধাময় দত্তেৰ পক্ষেই সংভব হয়নি। পদোন্নতি পদোন্নতিৰ আবেদনেৰ ফাইল নিয়ে মিনিস্ট্ৰিৰ ছুটাছুটি কৱে কিছু একটা অৰ্জন কৱতে। কেৱালীদেৱ রংমে ডাঃ সুধাময় দন্ত আশায় আশায় বসে থাকতেন। ওৱা বলত ডাঙুৱাৰ বাবু আমাৰ মেয়েৰ আমাশা হয়েছে, ভাল ওযুধ লিখে দিন তো। সুধাময় ওযুধ লিখে দিতেন। ভিজেস কৱতেন, আমাৰ কাজান্তি কৱে হবে ফৱিদ সাহেব? ফৱিদ সাহেব এক গাল হেসে বলতেন, এসব কি আৱ আমাদেৱ হাতে মশাই? অপেক্ষা কৰণ, দেখুন কি হয়, ফাইল তো সাধ্যমত নড়াছিল। সুধাময় দত্তেৰ রিটায়াৰমেটেৰ সময় চলে আসছে। তিনি মৱিয়া হয়ে উঠেছিলেন এসোসিয়েট প্ৰফেসৱ-এৰ একটি পদ লাভেৰ জন্য। এ কেনও লোভ নয়, এ হচ্ছে প্ৰাপ্য, এই পদটি তাৰ এতদিনে প্ৰাপ্য হয়েছে, তাৰ জুনিয়ৱৰা তাৰই মাথাৰ ওপৰ বসে আছে। ফৱিদ সাহেব বলতেন আজ নয় কাল আসুন। কাল এলে বলতেন পৱণ আসুন। একমাস পৱ আসুন, পনেৱেদিন পৱ আসুন। এই কৱে কৱে দেড় বছৰ যখন কাটল, পদোন্নতিৰ আশা বাদ দিলেন সুধাময়। এৱ পৱ আৱ দেড় দুমাসেৰ

মধ্যে তাৰ অবসৱ হচ্ছেৰ দিনও এসে গেল। শেষ পৰ্যন্ত সহকাৰি অধ্যাপক হিসেবেই অবসৱ হচ্ছে কৱলেন সুধাময় দন্ত।

সুধাময় অবশ্য পৱে বুৰোছিলেন মুসলমানেৰ এই আবাসভূমিতে নিজেৰ জন্য খুব বেশি সুযোগ সুবিধে আশা কৱা ঠিক নয়। ১৯৪৭ এ সাম্প্ৰদায়িক ভিত্তিতে পাকিস্তান সুষ্ঠিৰ পৱ থেকে প্ৰয়োজনে অপ্ৰয়োজনে এদেশেৰ শাসক শক্তিৰ পক্ষ থেকে শৱণ কৱিয়ে দেওয়া হয় এটি মুসলমানেৰ আবাসভূমি। সুধাময় মালেননি। শাসকশক্তি ও প্ৰশাসনেৰ আচৰণে অনেকেই ভাৱতে বাধ্য হয়েছেন যে এ দেশে তাৰা নাগৱৰিক হিসেবে সমৰ্মাণী পেতে পাৱেন না। এৱ পৱ অনেকেই নিশ্চিদে দেশ ত্যাগ কৱেছেন। সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশু হালদার, নিৰ্মলেন্দু ভৌমিক, রঞ্জন চক্ৰবৰ্তী সকলে। সুধাময় যাননি। অনেকেই বলেছিলেন সুধাময় চল, এ হচ্ছে মুসলমানেৰ হোমল্যান্ড, এখনে নিজেৰ জীবনেৰ কোনও নিশ্চয়তা নেই। নিজেৰ জন্মেৰ মাটিতে যদি নিশ্চয়তা না থাকে, নিশ্চয়তা তবে পৃথিবীৰ কোথায়? সুধাময় দন্ত বলেছিলেন, দেশ ছেড়ে পালাতে আমি পাৱব না। তোমোৱা যাচ্ছ যাও। এ আমাৰ বাপ ঠাকুৰীৰ ভিত্তে। নারকেল সুমুৰিৰ বাগান, ধানি জমি, যোলো বিঘাৰ ওপৱ বাড়ি এসব ছেড়ে শিয়ালদা টেক্ষনেৰ উদ্বাস্তু হব এ আমাৰ ইচ্ছে নয়। সুধাময় দন্ত থেকে গিয়েছেন দেশে। দেশভাগেৰ চৰ বছৰ পৱ কিৱণময়ীকে বিয়ে কৱে সংসাৰ পেতেছেন। কিৱণময়ী ছিল যোল বছৰেৰ তৱৰী। ব্ৰাহ্মণবাড়িয়াৰ মেয়ে, বাবা ছিলেন ব্যাংকেৰ অফিসাৰ। সুধাময় দন্ত কিৱণময়ীকে কলেজে ভৰ্তি কৱিয়ে দিয়েছিলেন। কিৱণময়ীৰ গানেৰ গলা ছিল চমৎকাৰ।

এ কথা ঠিক- প্ৰাশাসন, পুলিশ কিংবা সেনাবাহিনীৰ উচ্চপদে হিন্দুদেৱ নিয়োগ বা পদোন্নতিৰ ব্যাপারে বাংলাদেশে আইনেৰ কোনও বাধা নেই কিন্তু দেখা যায় মৰণালয়-গুলোৱ কোনও সেকেটাৰি বা এডিশনাল সেকেটাৰিৰ পদে কোনও হিন্দু সাম্প্ৰদায়ীৰ লোক নেই। জয়েট সেকেটাৰি আছেন একজন, আৱ হাতে গোনা কজন আছেন ডেপুটি সেকেটাৰি। সুধাময়েৰ বিখ্যান সেই একজন জয়েট সেকেটাৰি এবং কয়েকজন ডেপুটি সেকেটাৰিৰ নিচয় পদোন্নতিৰ আশা কৱেন না। ছয় জন মা৤্ৰ হিন্দু ডিসি আছেন সারা দেশে। পুলিশেৰ নিচু পদে হয়ত তাদেৱ নেওয়া হয় কিন্তু এসপি পদে হিন্দু কজন আছেন? সুধাময় ভাৱেন আমি আজ সুধাময় দন্ত বলেই আমাৰ এসোসিয়েট প্ৰফেসৱ হবাৰ পথে এত বাধা আমি যদি মোহাম্মদ আলী অথবা সলিমুল্লাহ চৌধুৰী হতাম তবে নিশ্চয় এই বাধা থাকত ন্তু। সুধাময় দন্ত জানেন ফৱেন সাৰ্ভিসে হিন্দু নেই। হাইকোৱে হিন্দু জজ মা৤্ৰ একজন। সেনাবাহিনীতে মা৤্ৰ ছয়জন কমিশন পাণ অফিসাৰ। কৰ্ণেল মা৤্ৰ একজন, বাকিৱা মেজৱ। ব্যবসা-বাণিজ্য কৱতে গেলেও মুসলমান অশৰীদাৰ না থাকলে কেবল হিন্দু প্ৰতিষ্ঠানেৰ নামে সব সময় লাইসেন্স পাওয়া যায় না। তাহাড়া সৱকাৰ নিয়মিতিৰ ব্যাংক, বিশ্বেত শিল্পৰ সংস্থা থেকে শিল্পকাৰখনা গড়াৰ জন্য ঝুণ দেওয়াও হয় না।

সুৱজন বিষম টানাপোড়েনেৰ মধ্যে বড় হয়েছে। সে সাতচলিশেৰ সাম্প্ৰদায়িক দেশভাগ দেখেনি, পঞ্চাশেৰ দাঙ দেখেনি। তাৰ জন্ম আটান্তু কি উন্নয়াটে। সে তাৰ বাবাৰ দেশপ্ৰেমেৰ ওপৱ আচমকা একটি বালিৰ বস্তা দেখেছে মুখ থুবড়ে পড়তে। বাহানোৱাৰ আন্দোলনেৰ সময় ছাত্ৰ ছিলেন, তিনি ও মিছিল কৱেছেন 'ৱৰ্ষত্বায়া বাংলা চাই' বলে ঢাকাৰ

রাস্তায় শুধু রফিক সালাম বরকতের নয়, মিছিলে সুধাময়েরও পায়ের ছাপ আছে। কী ভীষণ উত্তেজনা তখন, সারা শরীরে টগবগ করে নাচছে আনন্দলনের আনন্দ। 'উন্মুক্ত হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষ্য'- মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর এই সিদ্ধান্তের বিরঙ্গকে ফেপে উঠেছিল সাহসী ও সচেতন বাঙালি তরঙ্গের। তারা রাষ্ট্রভাষ্য বাংলার দাবিতে পাকিস্তানের শাসক-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিনত, ন্যূজ মেরদও সোজা করে দাঁড়িয়েছে, প্রতিবাদ করেছে, পুলিশের গুলির মুখে ঘুরকেরা ঢাকার রাজপথে বুকের রক্ত ঢেলে মৃত্যুকে পর্যন্ত বরণ করেছে, কিন্তু কেউ দাবি ছাড়েনি, রাষ্ট্রভাষ্যকে বাংলা করবার অনমনীয় যৌক্তিক দাবি। উন্নসস্তরের গণআনন্দলনে কিরণময়ী তাঁকে ঘরে আগন্তে পারেনি। কিরণময়ী যেতে দিত না তাঁকে বাইরে, বলত- মিছিলে ওরা গুলি ছেঁড়ে, তুমি যেও না। সুধাময় দন্ত বায়ানোর আনন্দলনে ছিলেন, তিনি উন্নসস্তরে ঘরে বসে থাকবার মানুষ নন। আইনুর খানের লেনিয়ে দেওয়া পুলিশবাহিনী তখন বাঙালির মিছিল ছ্রত্বপ করে দেয়, গুলি ছেঁড়ে। এগার দফার দাবি নিয়ে বাঙালি তখন পাকিস্তানি সামরিক জাত্তার বিরুদ্ধে আবারও ক্ষিপ্ত হয়েছে।

একান্তরের মার্টে সুধাময় তখন ময়মনসিংহে, ঢাকা মেডিকলে পড়ানোর পাট রুকিয়ে ঢাকরি করতে ময়মনসিংহে গেছেন, নিজের এলাকায়। শেখ মুজিবের ৭ই মার্টের রেসকোর্সে বসে শোনা হয়নি। আট তারিখ বিকেলে ঢাকা থেকে শরীফ, বাবুলু, ভাষণ রেসকোর্সে বসে শোনা হয়নি। এসে ঢোখমুখ লাল, প্রচও উত্তেজনা শরীরে ও মনে, সুধাময়ের ফয়জুল, নিমাই ফিরে এসে ঢোখমুখ লাল, প্রচও উত্তেজনা শরীরে ও মনে, সুধাময়ের দশদৈৰ্ঘ্যী বাজারের ফার্মেসীতে ঢুকে বলল, মুজিব বলেছেন—আমাদের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, আমাদের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আর যদি একটা গুলি ঢেলে, আর যদি আমার ভাইদের হত্যা করা হয়, তবে তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শক্র মোকাবেলা করতে হবে। বলতে বলতে শরীফরা উত্তেজনায় কাঁপছিল। সুধাময় শরীফের হাত ধরে রেখেছিলেন মুঠোর মধ্যে। তবে কি আমরা এখন কোনও আনন্দলন বা যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত হব? সুধাময়ের এই প্রশ্নের জবাব ওরা দিয়েছিল— নিচ্য।

যেদিন শরীফ বাবুলুর সঙ্গে তাঁর শহর ছেঁড়ে ঢেলে যাবার কথা, কিরণময়ী আর সুরজনের থাকবার ব্যবস্থা করে ফেলেছিল সুধাময়, সেদিনই নিমাই এসে বলল— ওরা হিন্দু ধরণে সুধাময়, পালাই চল।

পালাব?

হ্যাঁ পালাব।

তবে যুদ্ধে যাবার কথা? সকলেই তো দেখি যুদ্ধে যাচ্ছে। জামাল, রশিদ মনজুর ঢেলে গেছে। ইন্স, সাবের, ফরহাদ ওরা সবাই গেছে। এতদিন কুন্দনবার বৈঠক হল আমরা যুদ্ধে যাব, ভারতে গিয়ে ট্রেনিং নেব। কিরণময়ী এখানে ফয়জুলদের বাড়ি থাকবে। তার কি হবে তবে?

সবয় নেই সুধাময়। এখনও সিদ্ধান্ত নাও কী করবে। দেরি করলে বিপদ হতে পারে। নিমাই ঢেলে গেল।

সুধাময় বিপদের কথা ভাবেননি। কিরণময়ীকে ফয়জুলদের বাড়ি রেখে সুধাময় ঢেলেই যাবেন ভাবছেন, কিরণময়ীকে কিছু জানাননি, তিনি যুদ্ধে যাবেন কিরণময়ী এটি

মেনে নেবে না। ফয়জুলদের গ্রামের বাড়ি ফুলপুর, সেখানে দু ছেলেমেয়ে নিয়ে কিরণময়ী থেকে যাবে আর সুধাময় ঢেলে যাবেন এই নির্মম সিদ্ধান্ত কিরণময়ী কী করে মেনে নেবে। ফয়জুলের সঙ্গে কথা হয়েছে। তার মা বাবা কিরণময়ীকে আশ্রয় দেবে। ফয়জুল ও যাচ্ছে ফয়জুলের সঙ্গে কথা হয়েছে। তার মা বাবা কিরণময়ী, সুরজন, মাত্র ছইমাস বয়সের যুদ্ধে। কী ভীষণ উত্তেজনা তখন সুধাময়ের। প্রিয় কিরণময়ী, সুরজন, মাত্র ছইমাস বয়সের মায়া সবই তুচ্ছ হয়ে গেল দেশের বাধীনতার কাছে।

শহর ছেড়ে মানুষ ঢেলে যাচ্ছে গ্রামের দিকে। ফাঁকা হয়ে আসছে রাস্তা, যানবাহন মানুষজন কম ঢেলে। কিরণময়ী বলছে চল ইত্তিয়া যাই, হিন্দুদের ধরে ধরে মারছে, পড়ি যারা হিন্দু ছিল, কেউ নেই, সবাই ইত্তিয়া ঢেলে গেছে। তুমি পড়ে আছ কিসের আশায়?

সুধাময় পালাবেন না এরকমই ভেবেছিলেন। নিমাই তার আয়ীয়-স্বজনসহ পালিয়েছে ভারতে। সুধাময় বাড়ির দরজায় লাগাবার জন্য দুটো তালা যোগাড় করে বললেন, টাকাপয়সা আর তোমাদের কিছু কাপড়-চোপড় নিয়ে নাও।

আর তুমি? কিরণময়ী জিজ্ঞেস করল।

এই বাড়ি পাহারা দিতে হবে না? এত বড় বাড়ি।

সুধাময়ের বাড়ি আসলেই বেশ বড়। ব্রাক্ষপণ্ডীর বড় মাঠ বড় পুকুরঅলা বাড়ি এই একটিই। বাড়ির চারদিকে সার বেঁধে সুপুরি গাছ। সদর গেট খুলে ঢকলেই ফুলের বাগান। গাছ গাছলি দেখা বাড়িটি পুরোনো আপত্তের। সুধাময় ছিলেন বাবার একমাত্র সন্তান। বাবা ছিলেন ডাকসাইটে পুলিশ অফিসার। সুধাময়ের ঠাকারদা ছিলেন শশিকান্ত জামিদারের নামের। বাড়িটি তাঁরই বানানো সংস্কৃত। অথবা কেনা।

কিরণময়ী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বলল, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। আমাকে ফয়জুলের মা বললেন আমার নাম যেন ফাতেমা আখতার বলি, শাখা সিদ্দুর পরতে মানা করলেন।

সুধাময়ের বুকের মধ্যে সেই প্রথম ধক করে একটি শব্দ হল।

কেন তোমার নাম ফাতেমা আখতার হবে? তোমার নাম কিরণময়ী। কিরণময়ী দন্ত।

সুধাময় বললেন। কিন্তু তাঁর মনে সন্দেহের একটি কঁটা বিধে রইল। তবে কি সত্যিই হিন্দু বলে তাঁরা এখন লাঞ্ছিত হবেন বেশি, তাঁদের ওপর নির্যাতন একটু বেশি হবে? সুধাময় অবশ্য খবর পাচ্ছেন যাদের যাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানিরা। যাদের গুলি করছে, নির্বিচারে মেরে ফেলছে ওরা সবাই হিন্দু নয়, মুসলমানই বেশি। কিরণময়ীকে এখানে রেখে যাওয়া কি নিরাপদ নয়, ফয়জুল কবীরের বাড়িতে! শহর ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠছে। সুধাময় ছির করতে পারছেন না তিনি কি করবেন। তাঁর ধূতি পরবার অভেস। পাশের বাড়ির আলম সাহেবের বললেন, ধূতি ছেড়ে দিন, ধূতি পরা ঠিক নয় এখন।

ধূতি পরা ঠিক নয়। কিরণময়ীর নাম ফাতেমা আখতার অনুভব করলেন তিনি এবং তাঁর পরিবার হিন্দু সম্পদায়ের; এবং সে কারণেই তাঁর ভবিষ্যৎ এবং ফয়জুল, আলম বা সলিমুরাহর ভবিষ্যৎ এক নয়, কিছুটা ভিন্ন। রাস্তায় বেরোলে যে অন্ন কজন বাঙালি চোখে পরে ওরা মাথায় টুপি পরে। সুধাময় প্যান্ট সার্ট ছেড়েছেন

রাস্তায় শুধু রফিক সালাম বরকতের নয়, মিছিলে সুধাময়েরও পায়ের ছাপ আছে। কী ভীষণ উত্তেজনা তখন, সারা শরীরে টগবগ করে নাচছে আনন্দলনের আনন্দ। 'উন্মুক্ত হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'- মোহাম্মদ আলী জিম্মাহর এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ফেন্সে উঠেছিল সাহসী ও সচেতন বাঙালি তরঙ্গেরা। তারা রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে পাকিস্তানের শাসক-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিনত, ন্যূজ মেরিন্ডও সোজা করে দাঁড়িয়েছে, প্রতিবাদ করেছে, পুলিশের গুলির মুখে যুবকেরা ঢাকার রাজপথে বুকের রঞ্জ ঢেলে মৃত্যাকে পর্যন্ত বরণ করেছে, কিন্তু কেউ দাবি ছাড়েনি, রাষ্ট্রভাষাকে বাংলা করবার অনমনীয় মৌলিক দাবি। উন্নসস্তরের গণআনন্দলনে কিরণময়ী তাঁকে ঘরে আগলে রাখতে পারেনি। কিরণময়ী যেতে দিত না তাঁকে বাহিরে, বলত- মিছিলে ওরা গুলি হোড়ে, তুমি যেও না। সুধাময় দন্ত বায়ানোর আনন্দলনে ছিলেন, তিনি উন্নসস্তরে ঘরে বসে থাকবার মানুষ নন। আইন্যুব খানের লেলিয়ে দেওয়া পুলিশবাহিনী তখন বাঙালির মিছিল ছ্রত্বদ্ব করে দেয়, গুলি হোড়ে। এগার দফার দাবি নিয়ে বাঙালি তখন পাকিস্তানি সামরিক জাতির বিরুদ্ধে আবারও কিণ্ঠ হয়েছে।

একান্তরের মার্চে সুধাময় তখন ময়মনসিংহে, ঢাকা মেডিকেলে পড়াওনার পাট ছুকিয়ে ঢাকরি করতে ময়মনসিংহে গেছেন, নিজের এলাকায়। শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের সংগ্রাম রেসকোর্সে বসে শোনা হয়েনি। আট তারিখ বিকেলে ঢাকা থেকে শরিফ, বাবলু, ফয়জুল, নিমাই ফিরে এসে চোখে লাল, প্রচও উত্তেজনা শরীরে ও মনে, সুধাময়ের স্বদেশী বাজারের ফার্মেসীতে ঢুকে বলল, মুজিব বলেছেন—আমাদের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, আমাদের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আর যদি একটা গুলি ঢেলে, আর যদি আমার ভাইদের হত্যা করা হয়, তবে তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শক্র মোকাবেলা করতে হবে। বলতে বলতে শরিফরা উত্তেজনায় কাঁপছিল। সুধাময় শরিফের হাত ধরে রেখেছিলেন মুঠোর মধ্যে। তবে কি আমরা এখন যে কেনও আনন্দলন বা যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত হব? সুধাময়ের এই প্রশ্নের জবাব ওরা দিয়েছিল— নিচ্য।

যেদিন শরিফ বাবলুর সঙ্গে তাঁর শহর ছেড়ে ঢেলে যাবার কথা, কিরণময়ী আর সুরঞ্জনের থাকবার ব্যবস্থা ও করে ফেলেছিল সুধাময়, সেদিনই নিমাই এসে বলল— ওরা হিন্দু ধরেছে সুধাময়, পলাই চল।

পালাব?

ঝঁয় পালাব।

তবে যুদ্ধে যাবার কথা? সকলেই তো দেখি যুদ্ধে যাচ্ছে। জামাল, রশিদ মনজুর ঢেলে গেছে। ইদিস, সাবের, ফরহাদ ওরা সবাই গেছে। এতদিন কুকুদ্বার বৈঠক হল আমরা যুদ্ধে যাব, ভাবতে গিয়ে ট্রেনিং নেব। কিরণময়ী এখানে ফয়জুলদের বাড়ি থাকবে। তার কি হবে তবে?

সময় নেই সুধাময়। এখনও সিদ্ধান্ত নাও কী করবে। দেরি করলে বিপদ হতে পারে। নিমাই ঢেলে গেল।

সুধাময় বিপদের কথা ভাবেননি। কিরণময়ীকে ফয়জুলদের বাড়ি রেখে সুধাময় ঢেলেই যাবেন ভাবেন, কিরণময়ীকে কিছু জানাননি, তিনি যুদ্ধে যাবেন কিরণময়ী এটি

মেনে নেবে না। ফয়জুলদের প্রামের বাড়ি ফুলপুর, সেখানে দু ছেলেমেয়ে নিয়ে কিরণময়ী থেকে যাবে আর সুধাময় ঢেলে যাবেন এই নির্মম সিদ্ধান্ত কিরণময়ী কী করে মেনে নেবে। ফয়জুলের সঙ্গে কথা হয়েছে। তার মা বাবা কিরণময়ীকে আশ্রয় দেবে। ফয়জুল ও যাচ্ছে যুদ্ধে। কী ভীষণ উত্তেজনা তখন সুধাময়ের। প্রিয় কিরণময়ী, সুরঞ্জন, মাত্র ছ'মাস বয়সের মায়া সবাই তুচ্ছ হয়ে গেল দেশের স্বাধীনতার কাছে।

শহর ছেড়ে মানুষ ঢেলে যাচ্ছে গ্রামের দিকে। ফাঁকা হয়ে আসছে রাস্তা, যানবাহন মানুষজন কম ঢেলছে। কিরণময়ী বলছে চল ইভিয়া যাই, হিন্দুদের ধরে ধরে মারছে, পড়শি যারা হিন্দু ছিল, কেউ নেই, সবাই ইভিয়া ঢেলে গেছে। তুমি পড়ে আছ কিসের আশ্রয়?

সুধাময় পালাবেন না এরকমই ভেবেছিলেন। নিমাই তার আয়োয়-স্বজনসহ পালিয়েছে ভারতে। সুধাময় বাড়ির দরজার লাগাবার ডন্য দুটো তালা যোগাড় করে বললেন, টাকাপয়সা আর তোমাদের কিছু কাপড়-চোপড় নিয়ে নাও।

আর তুমি ? কিরণময়ী জিজেন করল।

এই বাড়ি পাহারা দিতে হবে না? এত বড় বাড়ি।

সুধাময়ের বাড়ি আসলেই বেশ বড়। ব্রাক্ষপল্লীর বড় মাঠ বড় পুকুরঅলা বাড়ি এই একটিই। বাড়ির চারদিকে সার বেঁধে সুপুরি গাছ। সদর গেট খুলে ঢেকলেই ফুলের বাগান। গাছ গাছালি ধেরে বাড়িত পুরোনো স্থাপত্যের। সুধাময় ছিলেন বাবার একমাত্র সন্তান। বাবা ছিলেন ডাকসাইটে পুলিশ অফিসার। সুধাময়ের ঠাকুরদা ছিলেন শিশিকান্ত জমিদারের নায়েব। বাড়িটি তারই বানানো সংস্কৃত। অথবা কেনন।

কিরণময়ী ফুপিয়ে কেঁদে উঠল। বলল, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। আমাকে ফয়জুলের মা বললেন আমার নাম যেন ফাতেমা আখতার বলি, শীর্খ সিদ্ধুর পরতে মানা করলেন।

সুধাময়ের বুকের মধ্যে সেই প্রথম ধক করে একটি শব্দ হল।

কেন তোমার নাম ফাতেমা আখতার হবে? তোমার নাম কিরণময়ী। কিরণময়ী দন্ত।

সুধাময় বললেন। কিন্তু তাঁর মনে সন্দেহের একটি কাঁটা বেশি রেখে রইল। তবে কি সত্যিই হিন্দু বলে তাঁর এখন লাঞ্ছিত হবেন বেশি, তাঁদের ওপর নির্যাতন একটু বেশি হবে? সুধাময় অবশ্য ঘবরের পাছেন যাদের যাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানিরা, যাদের গুলি করছে, নির্বিচারে মেরে ফেলছে ওরা সবাই হিন্দু নয়, মুসলমানই বেশি। কিরণময়ীকে এখানে রেখে যাওয়া কি নিরাপদ নয়, ফয়জুল কবীরের বাড়িতে। শহর দ্রুমশ ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। সুধাময় স্থির করতে পারছেন না তিনি কি করবেন। তাঁর ধূতি পরবার অভ্যেস। পাশের বাড়ির আলম সাহেব বললেন, ধূতি ছেড়ে দিন, ধূতি পরা ঠিক নয় এখন।

ধূতি পরা ঠিক নয়। কিংময়ীর নাম ফাতেমা আখতার। সুধাময় এই প্রথম অনুভব করলেন তিনি এবং তাঁর পরিবার হিন্দু সম্প্রদায়ের; এবং সে কারণেই তাঁর ভবিষ্যৎ এবং ফয়জুল, আলম বা সলিমুরাহর ভবিষ্যৎ এক নয়, কিছুটো ভিন্ন। রাস্তায় বেরোলে যে অন্ত কজন বাঙালি চোখে পরে ওরা মাথায় টুপি পরে। সুধাময় প্যান্ট সার্ট ছেড়েছেন

অনেকদিন। ধৃতিতেই তিনি স্বাঞ্চল্য বোধ করেন বেশি। ফয়জুল বিকেলে দুটো পাজামা দিয়ে গেল, বলল, এটি পরে নেবেন, আমি সন্ধ্যায় আসব। সন্ধ্যায় ওদের ফুলপুর পাঠিয়ে দিয়ে শরীফ, বাবু, ফয়জুল আর সুধাময় নালিতাবাড়ি পার হয়ে সীমাত্ত পেরিয়ে যাবেন— এককর্মই কথা হল। সুধাময় বিকেলে রাস্তায় বেরোলেন শহরের অবস্থা দেখতে। বেশি দূর যেতে পারেননি, চৰপাড়ার মোড়ে তার পথরোধ করল মিলিটারিবা। জিজ্ঞেস করল নাম কি?

নাম? সুধাময় ভাবলেন কি নাম আমার? সুধাময় দণ্ড? বাবার নাম সুকুমার দণ্ড? ঠাকুরদাদার নাম জোতির্ময় দণ্ড? সুধাময়ের জিভ ভারি হয়ে এল। ওরা আবার নাম জিজ্ঞেস করল। সুধাময় জানেন না সুধাময়ের কষ্ট থেকে অবচেতনেই বেরোল 'সিরাজউদ্দিন হোসেন'। গলা কাঁপল থানিক।

ওরা সংখ্যায় তিনজন ছিল। ইটাছিল। শুশানের মত শহরটি। দোকানপাট বক। দুনসান। ওরা সুধাময়ের বাছ ধরে রাখল শক্ত করে। বলল, খোল দেখি, লুঙ্গি খোল। লুঙ্গি সুধাময় খোলেননি। ওরাই খুলেছিল টান মেরে। সুধাময় লজ্জায় ভয়ে চোখ বক করলেন। ওরা খুলে প্রথম লাখি লাগাল সুধাময়ের পেটে। পেট চেপে সুধাময় বসতে যাবেন উরু হয়ে, হঠাৎ পেছন থেকে আরও এক লাখি পড়ল পিঠের ওপর। সুধাময় না পারলেন দাঁড়াতে, না বসতে। ওরা কাছেই একটি ক্যাম্পে নিয়ে গেল সুধাময়কে। কী মাস তখন, সুধাময়ের মনে নেই—এপ্রিল? মে? জুন? ভাবতেই তাঁর শরীরের ভেতর তীব্র এক ঝাঁকুনি দিয়ে অক্ষকার হয়ে যায় জগৎ। সুধাময়ের মনে পড়ে না ক্যাম্প কতদূর ছিল, ক্যাম্পে কী হয়েছিল তাকে নিয়ে। সুধাময় এইটুকু জানেন যে তিনি শেষ অবধি বেঁচে ফিরেছেন।

আর যুক্তে যাওয়া হয়নি সুধাময়ের। ভারত যাওয়াও হয়নি। শরীফ, বাবুবু একা চলে গিয়েছিল। ফয়জুলের বাড়িতে কিরণময়ী, সুরজ্জন আর মায়াকে নিয়ে ডিসেম্বর পর্যন্ত পড়ে ছিলেন সুধাময়। শহরের বাড়িতে দরজায় তালা কেবল। সুধাময়ের মাঝেমধ্যে অবাক লাগে ওরা তাকে মেরে ফেলেনি কেন? শহরের রাস্তায় আস্ত একটি হিন্দু পেয়ে ওরা শু বেয়নেটে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কষ্ট দিল আর হা হা করে হাসল। রাইফেলের বাট দিয়ে ডান পাটা ডেঙে দিল, ব্যাস? আর কিছু নয়? অবশ্য আর একটা অসহানি ওরা ঘটিয়েছে। সুধাময় এই কথা পাঠপথে গোপন করতে চান। সেদিন ক্যাম্প থেকে বাড়ি ফিরে সুধাময় বলেছিলেন— বাঁচতে হলে কিরণময়ী আজ তুমি বরং খুলেই ফেল শীঘ্ৰ। কিরণময়ী কেন্দে উঠেছিলেন। সুধাময় নিজের হাতে কিরণময়ীর শীঘ্ৰ খুলে, সিঁদুর মুছিয়ে কালিবাড়ি ফেরি ঘাটের দিকে গিয়েছিলেন।

যাবেন ফুলপুর।

কিরণময়ী জিজ্ঞেস করেছিলেন, বাড়ির কি হবে?

যুক্তিয়ে খুড়িয়ে অসুস্থ শরীরে সুধাময় শহর ছাড়লেন। দেশের মায়ায় পড়ে তিনি শরণার্থী হয়ে ভারত যাননি। যুক্তে যাবার দিনই তাঁকে মেরে খোঁড়া করে দেওয়া হল। তাঁর যুক্তে যাওয়াও হল না। ফুলপুর পালিয়ে এনে ভাঙা পা নিয়ে ফয়জুলের বাড়িতে অসুস্থ পড়ে রইলেন। নিজের পা নিজেই প্লাটার করে ওশে ছিলেন অনেকদিন। কিরণময়ীর নাম হল ফাতেমা আখতার। সুধাময়ের নাম আব্দুন সালাম, সুরজ্জন আর মায়ার ও নাম পাটে সাবের আর ফারিয়া করা হল। ছামাসের বাচ্চা, তারও নাম বদল হল।

ভারত ভাগের পর দেশত্যাগ করেছে দেশের প্রচুর হিন্দু। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত পাকিস্তান ভাগ হবার পর সংখ্যালঘুদের জন্য সীমাত্ত খোলা ছিল। সে সময় প্রচুর হিন্দু বিশেষত উচ্চবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী ভারতে চলে যান। ১৯৮১ সালের লোক গণনা অনুযায়ী দেশে হিন্দু ধর্মবলহী লোকের সংখ্যা ১ কোটি ৫ লক্ষ ৭০ হাজার অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ১২.১ শতাংশ। গত ৮ বছরে এ সংখ্যা বেড়ে নিশ্চয় সোঁয়া থেকে দেড় কোটিতে দাঁড়িয়েছে। তবে এ অনুমান সরকারি গণনানির্ভর। সুধাময়ের মনে হয় লোকগণনাতেও বৈষম্য দেখানো হয়। হিন্দু ধর্মবলহীর প্রকৃত সংখ্যা সরকারি হিসাবের চেয়ে অনেক বেশি। ২ কোটির মত। মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ হিন্দু আছে দেশে। তবে একথা সত্ত্ব এদেশে হিন্দুসংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। ১৯৯১ সালের হিসেবে বলে এদেশে হিন্দু ছিল ৩০.১ শতাংশ। ১৯১১ সালে এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৩১.৫ শতাংশ। ১৯২১ সালে ৩০.৬ শতাংশ, ১৯৩১ সালে ২৯.৮ শতাংশ, ১৯৪১ সালে ২৮ শতাংশ। ৪১ বছরে ভারত ভাগের আগে হিন্দু কমে ২২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ৪০ বছরে যা-হাস পায়নি, ১০ বছরে তার চেয়ে বেশি-হাস পেল। পাকিস্তান আমল জুড়ে হিন্দুরা ধীরে ধীরে চলে যেতে থাকে ভারতে। ১৯৬১ সালের হিসেবে হিন্দু সংখ্যা ১৮.৫ শতাংশে দাঁড়ায়, ১৯৭৪ সালের হিসেবে ১৩.৫ শতাংশে। কিন্তু দেশ স্বাধীনের পর হিন্দুসংখ্যা-হাসের হার কমে যায় অনেকটা বিভাগপূর্ব কালের মত। ১৯৭৪ সালে হিন্দু জনসংখ্যার হার ১৩.৫ শতাংশ, ১৯৮১ সালে যদি ১২.১ শতাংশ হয়, তবে তো এ নিশ্চয় করে বলা যায় যে, সংখ্যালঘুরা ভিত্তে ছাড়ছে আগের চেয়ে কম। কিন্তু কত সাল অবধি এই সংখ্যা কম? তিরাশি, চুরাশি, পঁচাশি, উন্নলবই, নবরই? নবরই-এর পর কি হিন্দুসংখ্যা-হাস পাবে না দেশে? বিবানবই-এর পর?

সুধাময় এখন প্রায় বৃক্ষ। তিনি সুরজ্জনের কথার মূল্য দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। সুরজ্জন আজ তাদের বাড়ির বাইরে নেবে, কোথাও লুকিয়ে থাকবার জন্য। একাত্তরে সুধাময়ের ত্রাঙ্কপল্লীর বাড়িতে কিছুই ছিল না। ডিসেম্বরের শেষে ফুলপুর থেকে ফিরে এসে সুধাময় দেখেছিলেন বাড়ির খোপে খোপে কিছু ক্রতৃত বাসা বেঁধেছে। দু একটা শীর্ষ কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে থারে আছে। কিছু নেই সারা বাড়িতে, খুলো ছাড়া। ইট খুলে নিয়ে যেতে পারেনি তাই বিস্তি-এর গাঁথুনিতে ইটগুলো থেকে গেছে। তবু নতুন দেশে নতুন করে বেঁচে থাকবার আশায় সুধাময় আবার ঘরদের পরিকার করলেন। বলেনেন, কিরণময়ী, তুমি মন খারাপ ক’রো না। নতুন দেশ তো, ভাঙ্গু লুটপাট কত কোথাও হয়েছে দেখ, সবাই নতুন করে গড়ে তুলছে সব। প্রথম প্রথম কষ্ট হবে। পরে দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে। কিরণময়ী প্রতিবেশিদের তুলনা দিল, কই, ওদের বাড়ি তো লুঠ হয়নি। বেছে বেছে আমাদের কেন? শক্ত সাহেব, দাবির সাহেবেরা তো শহুর ছেড়ে কোথাও যাননি।

আমাদের দরজায় স্রেফ একটা তালা ঝুলছিল। তাই বোধহয় ডেঙে চুকেছে— সুধাময় বলেনেন কিন্তু তাঁর মনে আবার এক সদেহের কাঁচা বিধে রইল। ডিসেম্বরের আঠাত্তো তারিখ যখন শহরে ফিরলেন, ত্রাঙ্কপল্লীর মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন শওকত হোসেন। তিনি যেন কিছু অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। এতদিন পর দেখা, অথচ পাশ কেটে চলে গেলেন। তাঁরা কি কেউ আশা করেননি সুধাময়েরা একদিন ফিরে আসবেন?

পঁচাত্তরে ব্রাহ্মণদ্বীর বাড়ি বিক্রি করে ঢাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে সুধাময় নতুন করে সংসার সাজিয়েছেন। এই বাড়িও তচ্ছন্দ হয়েছে। লুঠ হয়েছে। পুড়েছে। নববই-এর তিরিশ ও একত্রিশ অঞ্চলের তারিখে কী বিভৎস কাও ঘটে গেছে দেশটিতে। সুধাময় কি আরেকবার শ্বরণ করবেন কী ঘটেছে সেই দুটো দিনে? হ্যা শ্বরণ করবেন, তবে আপাতত সুরজনের একটি পরামর্শ প্রয়োজন। সুরজন এই দুর্মোগের দিনে কোথাও তো তাদের নিতে পারে অস্ত প্রাণে বাঁচবার জন্য। বাড়ি লুঠ হয় হোক। কী আছে আর বাড়িতে। দু বছর আগে সবই তো আগুনে পোড়ানো হয়েছে। সম্পদশালী সুকুমার দন্তের সম্পদ বলতে তাঁর পুত্র সুধাময় দন্তের জীবন আর সুধাময়ের দুস্তান। এ ছাড়া আর কোনও ধনসম্পদ সুধাময়ের পক্ষে সঙ্গ হয়নি আগলে রাখ।

বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নোর যুক্তফন্ট নির্বাচন, বাষ্পটির শিক্ষা আন্দোলন, চৌষট্টির শামুরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ছেষটির ছয় দফা আন্দোলন, আটষটির আগরতলা যত্থ্যত্ব মামলা বিরোধী আন্দোলন, উন্নসভরের গণআন্দোলন ও ছাত্রদের এগার দফা আন্দোলন, সন্তরের সাধারণ নির্বাচন এবং একান্তরের মুক্তিযুদ্ধ এ কথা প্রমাণ করেছে যে ইজাতিত্বের কারণে দেশভাগ হওয়া ছিল ভুল একটি সিদ্ধান্ত। আবুল কালাম আজাদ বলেছিলেন— It is one of the greatest frauds on the people to suggest the religious affinity can unite areas which are geographically, economically, linguistically and culturally different. It is true that Islam sought to establish a society which transcends racial, linguistic, economic and political frontiers. History has however proved that after the first few decades or at the most after the first century, Islam was not able to unite all the muslim countries on the basis of Islam alone. জিন্নাহও জানতেন ইজাতিত্বের অসাড়তার কথা। মাউন্টব্যাটেন যখন পাঞ্জাব এবং বাংলা ভাগ করবার পরিকল্পনা করছিলেন। তখন জিন্নাহ বলেছিলেন— A man is Punjabi or a Bengali before he is Hindu or Moslem. They share a common history, language, culture and economy. You must not divide them. You will cause endless bloodshed and trouble.

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাঙালি Endless bloodshed and trouble দেখেছে যার চূড়ান্ত পরিণতি ছিল একান্তরের মুক্তিযুদ্ধ। এক লক্ষ বাঙালির রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা একথা প্রমাণ করেছে যে, ধর্ম কখনও জাতিসভার ভিত্তি নয়। ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাসই জাতি গঠনের ভিত্তি পাঞ্জাব মুসলমানের সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের একজাতিত্ব একদিন পাকিস্তান এনেছিল সত্য কিন্তু হিন্দু-মুসলমান ইজাতিত্বের ধারণা ভেঙে এদেশের বাঙালিরা দেখিয়ে দিয়েছে তারা পাকিস্তানের মুসলমানের সঙ্গে আপস করেনি।

হিন্দুরা আশা করেছিল স্বাধীন অসম্প্রদায়িক বাংলাদেশে তারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে। কিন্তু ধীরে ধীরে এই দেশের

কাঠামো থেকে ধসে পড়ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। সংসদে অষ্টম সংশোধনি বিল পাশ হয়ে গেল, রাষ্ট্রধর্ম এখন ইসলাম। যে মৌলবাদি দলটি একান্তরের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল, আর দেশ স্বাধীনের পর গর্তের মধ্যে দুরিয়েছিল, তারা আজ গর্ত থেকে মাথা বের করেছে। তারা আজ সদর্পে ঘূরে বেড়ায়, যিছিল মিটিং করে, তারাই নববই এর অঞ্চলে হিন্দুর মন্দির, ঘরবাড়ি লুটপাট করে ভেঙে পুড়িয়ে দিয়েছে।

সুধাময় মাথা নিচু করে বসে আছেন। এবার কী হবে তিনি জানেন না। বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলেছে উঞ্চ উন্ন্যত হিন্দুরা। তাদের পাপের প্রায়চিত্ত করতে হবে এখন বাংলাদেশের হিন্দুদের। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সুধাময়রা মৌলবাদি মুসলমানের থাবা থেকে নববই-এ মুক্তি পায়নি, বিরানবই-এ পাবে কেন? এবারও সুধাময়দের হিন্দুরের গর্তে লুকোতে হবে, শংকা কেটে গেল পরে বেরোতে হবে। সুধাময় হঠাতে কেঁপে ওঠেন আশংকায়, তিনি কি এই মাটির স্তান, যে মাটিতে আছে তাঁর জন্মগত অধিকার? তবে কেন এই দেশেই তাঁর প্রতিবেশির ভয়ে তাঁকে লুকোতে হয়? হিন্দু বলে? যেহেতু হিন্দুরা ওখানে মসজিদ ভেঙেছে। এই দায় কেন সুধাময়ের হবে? হঠাতে সুধাময় কঁকিয়ে ওঠেন যন্ত্রণায়। কিরণময়ী তাঁকে শুইয়ে দেন বিছানায়। মায়া অস্ত্র পায়চার করছিল বারান্দায়। সে বাবার ঘরে চুকে চেঁচিয়ে বলল, তোমরা তবে এখানেই পড়ে থাক, আমি যাচ্ছি।

কিরণময়ী জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাবি?

যাব, দাদা স্টান শুয়ে আছে, সে পেপার পড়ছে। তোমরা স্বৃতিচারণ কর বসে বসে। আমার বেঁচে থাকা জরুরি। আমি যাচ্ছি। দেখি পারুল নয়ত রিফাতদের বাড়ি বসে থাকি গিয়ে।

আর তোর নীলাঞ্জনা দন্ত নামটিকে কি করবি? সুধাময় চোখে মুখে উৎকঠা নিয়ে প্রশ্ন করলেন।

মায়া বলল, লা ইলাহা ইল্লাহাই মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ বললে নাকি মুসলমান হওয়া যায়, তাই হব, নাম হবে ফিরোজা বেগম।

মায়া! কিরণময়ী ধমকে উঠলেন। সুধাময় শূন্য দৃষ্টিতে তাকালেন একবার মায়ার দিকে, একবার কিরণময়ীর দিকে। মায়া সাতচল্লিশের দেশভাগ দেখেনি, পঞ্চাশের দাপ্ত দেখেনি, একান্তরের মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি, বুঝি হবার পর দেখেছে দেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, দেখেছে নববই এর বিভৎস আগুন, জীবন বাঁচাতে মায়া এখন যে কোনও চ্যালেঞ্জে যেতে প্রস্তুত।

সুধাময়ের দৃষ্টির শূন্যতা মায়াকে গ্রাস করে নেয়। তাঁর সামনে মায়া বলে আর কেউ থাকে না, মায়াকে একটি গোলকধাঁধার মত মনে হয়। সুধাময়ের বুকের ভেতর তীব্র একটি যন্ত্রণা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে।

মায়া সত্তি সত্তি বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে। সে পারুলের বাড়ি যাচ্ছে। কিন্তু সুধাময়ের কী হবে, অথবা কিরণময়ীর? সুরজনও যে কোনও দিকে চলে যেতে পারে।

সুধাময় এখন আর ধূতি পরেন না। বাহাতুর থেকে পঁচাত্তরে পর্যন্ত নিয়মিত পরতেন। এরপর বাড়ির পাশের দরজি দিয়ে গোটা পাঁচেক পাজামা বানিয়ে নিলেন। এরপর থেকে পাজামাই পরছেন, পাজামার ওপর লম্বা সার্ট। কিরণময়ীও আর আগেই মত মোটা সিন্দুর

পরে না, কপালে সিদুরের টিপ পরা— সেও বক্ষ হয়েছে। হাতের শাখাদুটো আছে কেবল। একাওঠে স্ত্রীর শাখাসিদুর খুলে ফেলেছিলেন সুধাময়। স্বাধীন বাংলাদেশে খুলে রাখা শাখাসিদুর আবার নতুন করে পরতে শুরু করেছিল। কিরণময়ী। কিন্তু দিন দিন কিরণময়ী বুঝতে পারে এতে জাত রক্ষা হচ্ছে বটে তবে মান রক্ষা হচ্ছে না।

সুরঙ্গন ঘর থেকে বেরিয়ে। বেরিয়ে সে প্রথম টিভিটি অফ করে। বাথরুমে যায়, দাঁত মাজে। মুখ হাত ধুয়ে সুধাময়ের বিছানায় পা তুলে আরাম করে বসে। কিরণময়ী ছেলের জন্য চা নিয়ে আসে। বাড়ি ত অঙ্গুত এক থমথমে ভাব। যেন কেউ মরেছে এইভাব। বাবা ছেলের সঙ্গে কথা বলছেন না, ছেলে তার মার সঙ্গে নয়। সুরঙ্গনও টের পেয়েছে মায়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। অবশ্য দেরোবার আগে সে অনেক চেষ্টা করেছে সকলকে বোঝাতে যে, যে কোনও দুর্দল্লিয়া ঘটে যেতে পারে। মায়া সবাইকে শুনিয়ে দিয়ে গেছে তার নাম ফিরোজা বেগম হলে তার কোনও অসুবিধে নেই। সুরঙ্গন জানে মায়ার সঙ্গে জাহাসীর নামের এক ছেলের প্রেম, তাই বড় সহজে সে ফিরোজা বেগম নামটি উচ্চারণ করতে পারে জাহাসীর ছেলো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, মায়ার দুঃখাস ওপরে। ওরা সম্ভবত বিয়েও করে ফেলনে একসময়। সুরঙ্গন তারে মায়াই বেশ আছে, ধর্ম কর্ম করে না, ওসবে বিখাসও নেই। কিন্তু প্রেমে যে সে এমন নিমগ্ন, ছেলেটি শেষ পর্যন্ত বিয়ে করবে তো! সুরঙ্গন তার নিজের জীবন দিয়ে বোঝে, পারভিনের সঙ্গে শেষ অবধি বিয়ে হঁ। হয় করেও তার হয়নি। পারভিন বলেছিল তুমি মুসলমান হও। সুরঙ্গন বলেছিল ধর্ম পাস্টনের প্রয়োজন কী বল, তার চেয়ে যার যা ধর্ম তাই থাকুক। যার যা ধর্ম তাই থাকবার ব্যবস্থাটি পারভিনের পরিবারের মনঃপূর্ণ হয়নি। তারা পারভিনের সঙ্গে একটি ব্যবসায়ীর বিয়ে দিয়ে দিলেন। পারভিনও কেবল কেটে বিয়ের পিপড়িতে বসল।

সুরঙ্গনের দিকে সুধাময় সেই একই শূন্য দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন। তিনি কি ভুল করেছেন ভারত না গিয়ে? যতবার ভারত যাবার পথ খোলা হল, ততবারাই তিনি সে পথ নিজেই বক্ষ করে দিয়েছেন। ভারত চলে গলে অবস্থা পাস্টাত নিশ্চয়। এভাবে ছেলের মুখের দিকে একটি নিরাপদ আশ্রয়। জন্য ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে হত না। সুরঙ্গনও বেশ নির্বিকার, যেন কিছুই হয়নি এভাবে সে কিরণময়ীর হাত থেকে ঢায়ের কাপ নিল, খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, ডিসেৱ চলে এল, পীত তেমন পড়েনি মনে হয়, মনে আছে শীতের ভোরে হেটবেলোয় খেঁজুরের রস, খেতাম।

কিরণময়ীর দীর্ঘস্থান ফেলে বললেন ভাড়া বাড়ি, খেঁজুর গাছ কোথায় পাবি। নিজের হাতে আগামো সব গাছগাছলির বাড়ি তো জলের দরে বিক্রি করে এলাম। ব্রায়পপুরীর বাড়িতে কিরণময়ীর হাতে লালো গাছের মধ্যে খেঁজুর গাছও ছিল। সুরঙ্গন পছন্দ করত খেঁজুরের রস। রসের ইাড়ি নামিয়ে আন্ত গাছ হাটার লোক, সুরঙ্গন আর মায়া নিচে দাঁড়িয়ে দেখত। এই দশ্য কিরণময়ীর চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। সুরঙ্গনের উদাস চোখেও একই দশ্য।

বাড়িটি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলেন সুধাময় দস্ত। মায়ার যখন ছ বছর বয়স তখন মায়াকে কুল থেকে বাড়ি আসবাব পথে কারা যেন ওকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। কারা, সুরঙ্গন জানত কারা ওরা। এডওয়ার্ড হুলুর গেটে আড়া দিত কিছু ছেলে, পৰেটে ধারালো ছোয়া নিয়ে ঘুরত, ওরাই, সুরঙ্গন অনুমান করত ওরাই এই কাওঠি করেছিল।

মায়াকে দুদিন আটকে রেখেছিল একটি ঘরে। দুদিন পর মায়া ঘরে ফিরে এসেছিল, একা একা ইঠিতে ইঠিতে। কোথাকে এসেছে, কারা ধরে নিয়েছিল, কিছু বলতে পারেনি। মায়া অস্বাভাবিক আচরণ করেছিল পুরো দুমাস। মানুষ দেখে ভয় পেত। চিকিৎসা করে উঠত মাঝারাতে, ঘুমের মধ্যে। এর পর পরই সুধাময়ের সিঙ্কান্ত নেন তিনি নিজের বাড়ি ছেড়ে, নিজের শহর ছেড়ে চলে যাবেন। পাশেই এক এডভোকেটের বাড়ি ছিল, রহিমউদ্দিন নাম। সুধাময় সেই রহিমউদ্দিনের কাছে পঞ্চাশ মাট লক টাকার বাড়িটিকে মাত্র চাল্লিং হাজার টাকায় বিক্রি করে চলে এলেন। সুরঙ্গন অবশ্য এর বিরুদ্ধে ছিল। সে বাড়ি ছেড়ে যাবে না, দরকার হলে সে পাড়ার মাস্তানদের বিকলকে কেইস করবে। রাতে রাতে তিল পড়তে লাগল বাড়িতে। উড়ো চিঠি আসে মোয়েকে ধরে নিয়ে যাবে তারা। সুধাময় থানায়ও গিয়েছিলেন। থানার পুলিশ বলল, কী বলব মশায়, আপনি কেইস করুন— তবে মনে হয় ন আমরা কিছু করতে পারব। সুরঙ্গন ওদের নাম জানত, বাবু, লিটন, সাদেক, ভুলন, টমাস। সতের আঠারো বছর বয়স ওদের, ওরা বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় শিশ দেয়, গেট খুলে বাড়িতে ঢুকে গাছের নারকেল, আম, পেয়ারা, বড়ই পেড়ে নিয়ে চলে যায়। বাগানের ফুল ছিড়ে নিয়ে যায়। অত্যাচার দিন দিন এমন বাড়ল যে সুধাময় রহিম উদ্দিনের কাছে গেলেন একদিন, বললেন, এ বাড়িতে আমি আর থাকছি ন। বদলিল চেষ্টা করছি, ঢাকায় বদলি হচ্ছি। বাড়িটি বিক্রিহী করে দেব দেব। তাছাড়া এখানে প্র্যাকটিসও আজকাল ভাল জমছে না। বেদশী বাজারের সেই পুরোনো ফার্মেন্টিতে বসে থাকি বিকেলবেলা, কিন্তু রোগী নেই। দুচারটে দুর্দিন রোগী আসে, তাও হিন্দু। এত দরিদ্র যে ওদের কাছ থেকে টাকা নিতে ইচ্ছে করে নন।

সুধাময় রিটায়ার করেছেন। সুরঙ্গনকে বলছেন চাকরি-বাকরির চেষ্টা কর সুরো, আমি আর ক’দিন বল। হার্টের অসুব, বাচ মনে হয় না বেশিদিন। কিরণময়ী সুরঙ্গনকে বুবিয়ে বলে— যদি এই দেশে আর টিকে থাকা সম্ভব না হয় মায়াকে নিয়ে তোমরা কলকাতা চলে যাও। আমি আর তোমার বাবা বাকি কটা দিন এখানেই থাকি।

কলকাতা যাবার কথা ওনল সুরঙ্গনের মাথায় রক্ত উঠে যায়। কেন যাবে সে কলকাতায়? কলকাতায় সুরঙ্গনের কাকা, মামা মাসি সকলে আছেন, কিন্তু সুরঙ্গনের কথন ও মনে হয় না কলকাতা তার দেশ। তবে সুরঙ্গন নিজের দেশের মাটি কামড়ে পড়ে থাকবার সেই জোরটাও অজ্ঞান আর পায় না। বিশেষ করে নববই এর পর তার মনে হয়েছে সে যেন এই দেশের কেট নয় এই দেশ যেন তার নয়, সে এখানে পরবাসী। অনেকে তাকে এও বলেছে, তোরা কে? ভারতের হিন্দু আর সুরঙ্গন কি এক হল? তবে কি সুরঙ্গনের দেশ আসলে ভারত? এই দেশে সে জন্য থেকে পরবাসী?

নববই-এ কী ঘটেছিল সুরঙ্গন ভাবতে চেষ্টা করে। তার হাতের চা ঠাপ্পা হয়ে যায়। কিরণময়ী সুধাময়ের শিয়ারের কাছে বসে আছে। সুধাময় চোখ বক্ষ করে শয়ে আছেন, অপেক্ষা করেছেন সুরঙ্গন কিছু আদেশ করে কি না, বলে কি না চল তৈরি হও। ঘরে তালা দাও। লুট হয় হোক, প্রাণে তো বাঁচি। সুধাময়ের চোখ জলে ভরে ওঠে। দেশভাগের পর থেকে প্রাণে বাঁচাবার জন্য লড়াই করে আসছেন তিনি, এখনও তাঁকে লড়াই করতে হচ্ছে। দূর থেকে একটি মিছিলের শৃদ ভেসে আসে। কিরণময়ী হাত্যাং উঠে জানালা বক্ষ করে দেয়। জানালা বক্ষ করলেও মিছিলটি যখন দীরে বাঁচির সামনে দিয়ে পার হয়

তথন স্পষ্ট শোনা যায় তারা শ্বেগান দিছে 'একটা দুইটা হিন্দু ধর সকাল বিকাল নাম্বা কর'। সুধাময়ও শোনেন মিহিলের ভাষা, তিনি কেপে গঠেন। সুরঞ্জনের হাতের কাপটি নড়ে ওঠে সামান্য।

নবাই এর অস্ত্রোবারেও এই শ্বেগান দিয়েছিল ওরা। কী ভীষণ কাও ঘটেছিল তখন, ঢাকেশ্বরী মন্দির আগন্তে পুড়িয়ে দিল ওরা, আর পুলিশ নিঝি দাঁড়িয়ে রাইল পাশে, কোনও বাধা দিল না, পুড়ে গেল মূল মন্দির, বিধ্বস্ত করে ফেলল মন্দিরের ভেতরে দেবীর আসন, ধ্বংস করে ফেলল নাটমন্দির, শিবমন্দির, অতিথিশালা, অতিথিশালার পাশে শীদাম ঘোমের বাঞ্ছিভিট। ধ্বংস করে ফেলল গৌড়ীয় মঠের মূল মন্দির, নাটমন্দির, গৌড়ীয় মঠের অতিথিশালা, মন্দিরের ভেতরের জিনিসপত্র লুটপাট করে, মাধব গৌড়ীয় মঠের মূল মন্দির ধ্বংস করল। জয়কালী মন্দির চূর্ণ হয়ে গেল, ব্রাহ্ম সমাজের বাউভারি ওয়ালের ভেতরের ঘবটি বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হল। রামসীতা মন্দিরের ভেতরে কারককাজ করা ঠাকুরের সিংহাসনটি বিধ্বস্ত করে ফেলল, বিধ্বস্ত করল মূল ঘর, নয়াবাজারের মঠ ভেঙে ফেলা হল, বনগাম মন্দির শাবল দিয়ে ভেঙে ফেলল প্রায়, শীখরি বাজারের মুখে সাতটি হিন্দুর দোকান ভাঙ্গচুর ও লুটপাটের পর পুড়িয়ে দেওয়া হল। শিলা বিতান, সুর্মা ট্রেডার্স, সেনুন ও টায়ারের দোকান, লঞ্চি, মিতা মার্বেল, সাহা কেবিনেট, রেষ্টুরেন্ট কিছুই রক্ষা পেল না। শীখরি বাজারের মোড়ে এমন ধৰ্মযজ ঘটল যে ব্যতদূর চোখ যায় ধ্বংসের চিহ্ন ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না। ডেমরা শনির আঁকড়ার মন্দির লুট হল, পঁচিশটি পরিবারের বাড়ি ঘর লুট করল দু'তিনশ সাম্প্রদায়িক সন্তানী। লক্ষ্মীবাজারে বীর ভদ্রের মন্দিরের দেয়াল ভেঙে ভেতরের সব নষ্ট করে দিল, ইসলামপুর রোডের হাতা আর সোনার দোকানগুলো লুটপাট করে আগুন লাগিয়ে দিল। নবাবপুর রোডের মরণচাদের মিষ্টির দোকান ভেঙে ফেলল, ভেঙে ফেললো পুরানা পল্টনের মরণচাদও। রায়ের বাজারের কালি মন্দিরটি ভেঙে মৃত্তি ফেলে দিল মাটিতে। সূতাপুরে হিন্দুদের দোকান লুট করে ভেঙে মুসলমানের সাইনবোর্ড খুলিয়ে দেওয়া হল। নবাবপুর রোডের ঘোষ এন্ড সস এর মিষ্টির দোকানটি লুটপাটের পর নবাবপুর ঘূর ইউনিয়ন ক্লাব এর একটি ব্যানার দোকানের পের টানিয়ে দেওয়া হল। ঠাট্টির বাজারের বটতলির মন্দির ভেঙে তছনছ করা হল। নবাবপুরে রামধনু পশারি নামের প্রাচীন দোকানটি লুট করা হল, বাবুবাজার পুলিশ ফাঁড়ির মাত্র কয়েক গজের মধ্যে শকলাল মিষ্টান্ন ভাণ্ডা ভেঙে চুরমার করা হল, প্রথ্যাত বাদ্যযন্ত্রের দোকান যতীন এন্ড কোং এর দোকান এবং কারখানা এমনভাবে ভেঙে ফেলল যে ঘরের ফ্যান থেকে শুরু করে সবই অগ্নিদন্ত হল, ঐতিহসিক সাপ মন্দিরের অনেকটা গুঁড়ে করে ফেলল, সদরঘাট মোড়ে রতন সরকারের মাকেটি লুটপাট করল, ভাঙ্গচুর করল। সুরঞ্জনের চোখের সামনে ভেসে ওঠে নববই-এর লুটপাটের ভয়াবহ দৃশ্যগুলো। নববই-এর ঘটনাকে কি দাঙ্গা বলা যায়? দাঙ্গা অর্থ মারামারি-এক সম্প্রদায়ের সংঘর্ষের নাম দাঙ্গা। কিন্তু এটিকে তো দাঙ্গা বলা যায় না, এটি হচ্ছে এক সম্প্রদায়ের ওপর আরেক সম্প্রদায়ের হামলা। অত্যাচার। নির্যাতন। সুরঞ্জনের হাতে চায়ের কাপ। চা সাঁও হতে থাকে, সুরঞ্জন চায়ে ছবুক দিতে ভুলে যায়। সে দাঁ দাঁ চেপে সংযত করে ক্রোধ।

২

সুরঞ্জনের বকুদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যাই বেশি। অবশ্য ওরা ধর্মটির তেমন মানে না, আর মানলেও সুরঞ্জনকে কাছের মানুষ ভাবতে ওরা কোনও দ্বিতীয় করেনি কখনও। কামাল তা গতবার নিজে এসে নিয়ে গেল বাড়িসুন্দ। শুধু তাই নয় পুলক, কাজল, অসীম, জয়দেবও তো সুরঞ্জনের বকু—কিন্তু প্রিয় এবং কাছের বকুদের মধ্যে কামাল, হায়দার, রবিউল, বেলালের মত নয়। সুরঞ্জনের যে কোনও বিপদে এরাই সাহায্য করেছে বেশি। সুধাময়কে একবার সোহারা ওয়ার্দি হাসপাতালে ভর্তি করবার প্রয়োজন হয়েছিল। খবর পেয়ে গাড়ি নিয়ে বেলাল ছুটে এল, বেলাল নিজে দৌড়েড়োড়ি করে হাসপাতালে ভর্তি করাল বারবার বলল, কাকাবাবু আপনি একটুও দুঃস্থিতা করবেন না, আমাকে আপনি নিজের ছেলেই মনে করবেন। সুরঞ্জনের মন ভরে গেছে দেখে। রবিউল বা কামালকেও যতটুকু আপন করে সুরঞ্জন পেয়েছে, অসীম বা কাজলকে ততটা পায়নি। শুধু তাই নয় পারভিনকে সুরঞ্জন যতটুকু ভালবেছিল সুরঞ্জনের মনে হয় না কোনও আর্চনা, লজিতা, দীপ্তি বা সুনন্দাকে সে ততটুকু ভালবাসতে পারবে।

ছেটবেলার একটি কথা সুরঞ্জনের মনে পড়ে। সে তখন ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে পড়ে। ক্লাস থ্রি ফ্রো হবে বোধহয়। খালেদ নামের এক ক্লাসমেটের সঙ্গে তার ক্লাসের পড়া নিয়ে তর্ক হচ্ছিল। তর্ক হচ্ছিল। তর্ক একসময় তুঙ্গে উঠলে খালেদ তাকে গাল দেয়, গালের মধ্যে কুকুরের বাচা, খয়ারের বাচার সঙ্গে হিন্দু শব্দটি ও ছিল। সুরঞ্জনও একই রকম গাল খালেদকে ফিরিয়ে দিচ্ছিল। সে ভেবেছিল কুকুরের বাচার মত হিন্দুও এক ধরনের গাল। তাই খালেদকে গালের বদলে গাল দিল— তুই হিন্দু। সুরঞ্জন অনেককাল ভেবেছিল হিন্দু বোধহয় তুচ্ছার্থে, ব্যদার্থে ব্যবহৃত কোনও শব্দ। পরে আরও বড় হয়ে সুরঞ্জন বুঝেছে হিন্দু একটি সম্প্রদায়ের মানুষ।

সুধাময় নাস্তিক মানুষ। তিনি কখনও বাড়িতে পূজোআর্চার ব্যবস্থা করেন না। অথচ তার সত্ত্বান্দের হিন্দু বলে পরিচয় দিতে হয় সমাজে। নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী মানুষকে মানুষ হিসেবে গ্রহণ করবার স্পর্ধা এখনও এই সম্মজ অর্জন করেনি। সুরঞ্জন দেখেছে মায়ার মধ্যে ও অস্তুত এক প্রতিক্রিয়া। ইস্কুলের পাঠ্য বিষয়গুলোয় ধর্ম একটি বাধ্যতামূলক বিষয় ছিল। ইসলামিয়াত ক্লাসে তাকে ক্লাস থেকে বার করে দেওয়া হত, সে একা একটি হিন্দু মেয়ে ক্লাসের বাইরে বারান্দায় রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকত, বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ, বড় বিছিন্ন মনে হত নিজেকে তার। বাড়িতে একদিন সে কাঁদতে কাঁদতে এসে বলল, আমাকে ক্লাস থেকে বার করে দেয় টিচার।

কেন?

সবাই ক্লাস করে। আমাকে নেয় না, আমি হিন্দু তাই।

সুধাময় শনে, সেই কত আগে মায়াকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরেছিলেন। অপমানে, কঠে তিনি সেদিনই চিচারের বাড়ি গিয়ে বলে এলেন আমার মেয়েকে ক্লাসের বাইরে

পাঠাবেন না। ওকে কথনও বুঝতে দেবেন না ও আলাদা কেউ। মায়ার মানসিক সমস্যা ঘূচল কিন্তু আলিফ বে তে সের মোখে ওকে দেয়ে বসল। কিরণময়ী বলত এসব করছে কী ও, নিজের জাতধর্ম বিলিয়ে এখন ইঙ্গুলে লেখাপড়া করতে হবে নাকি? সুধাময়ের অবশ্য মেয়ের আবাবি শেখাতে আপন্তি ছিল। কিন্তু একদিকে মেয়ের মানসিক অবস্থা সুস্থ রাখা জরুরি, অন্যদিকে মেয়ে আবাবি ইসলাম ধর্মকে পছন্দ করে ফেলে কিনা এই আশ্চর্ষকাও হয়। সুধাময় ওই ঘটনার সঙ্গে খানেকের মধ্যে ইঙ্গুলের হেতুমাটারের কাছে একটি দরবাতু লিখেছিলেন যে, ধর্ম হচ্ছে বাস্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার, এটি ঝুলের পাঠ্য হওয়া জরুরি নয়। তা ছাড়া আমি যদি আমার স্তুতিকে কোনও ধর্মে শিক্ষিত করবাব প্রয়োজন না মনে করি তবে তাকে তো ঝুল কর্তৃপক্ষ কথনও জোর করে ধর্ম শেখাবাব দায়িত্ব নিতে পারে না। আর ধর্ম নামক বিষয়টির পরিবর্তে মনীয়াদের বাধা, মহৎ বাস্তিদের জীবনী ইত্যাদি সম্পর্কে সকল সম্প্রদায়ের পাঠ্য একটি বিষয় রচনা করা যায়। তাতে সংখ্যালঘুদের হীনন্ময় বিচ্ছিন্ন ভাবিতও দূর হয়। সুধাময়ের এই আবেদনে ইঙ্গুল কর্তৃপক্ষ সাড়া দেননি। যেভাবে চলছিল, সেভাবেই চলছে।

সুরঞ্জন ছেটবেলা থেকে ছাত্রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল, আনন্দমোহন কলেজে সে ছাত্র ইউনিয়ন থেকে বৃগু সম্পর্ক পদে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল, জিতেও গিয়েছিল সেবার। কী উন্নত সময় গেছে তখন! কলেজে তার জনপ্রিয়তা যেমন ছিল, প্রভাবও ছিল তেমন। অথচ সুধাময় বাধা সাধলেন এ শহর থেকে দূরে কোথাও চলে যেতে হবে। কোথায়? সুধাময়ের ওই এক কথা তুমি মায়াকে নিয়ে দেশ ছেড়ে কলকাতায় চলে যাও। আমি নিরঞ্জনদার কাছে চিঠি লিখে দিচ্ছি। নিরঞ্জন সুধাময়ের পিসত্তো দাদা। কিন্তু সুরঞ্জন যাবে না। শেষ পর্যন্ত মিমাংসা এরকম হল যে ঠিক আছে দেশ না ছাড়ো শহর ছাড়তে হবে। শহর ছেড়ে তারপর ঢাকায় আসা। ঢাকায় দুর্ঘম তিনিরস্তের বাড়ি ভাড়া করে কোনও মতে বেঁচে থাকা। অচেল সেই বিত্ত নেই, সেই বিলাসিতার জীবন নেই, সব হারিয়ে সুধাময় মাথা ঝঁজলেন অন্ন পরিসরের ভাড়া ঘৰে— যে মানুষ একসময় অনড় থেকেছেন, মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে চেয়েছেন সেই মানুষই সবচেয়ে বেশি টলমলে ইলেন, সবচেয়ে বেশি পলায়নপর। সুরঞ্জন বোঝে সব, বুঝেই এবাব সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবাব আব বাড়ি ছেড়ে কোথাও পালাবে না। মুসলমানরা যদি বাড়ির জালিয়ে, তাদের সবাইকে কেটে রেখে চলে যায় তবুও সুরঞ্জন নড়বে না।

আট তারিখে সারা দেশে হরতাল ছিল। হরতাল আসলে ডেকেছিল ঘাতক দলাল নির্মূল করিটি। মাঝখান থেকে জামায়াতে ইসলামি জানায় তারা বাববি মসজিদ ধ্বংসের প্রতিবাদে হরতাল ডাকছে। সেই রাতে তাই প্রচার হল যে জামায়াতে ইসলামি দলটি সারাদেশে শাস্তিপূর্ণ হরতাল ঘটিয়েছে। সেদিন বিকেলে সুরঞ্জন বেরিয়েছিল হাঁটতে। কিরণময়ী বাধা দিয়েছিল বাইরে যাসনে সুরঞ্জন। সুরঞ্জন তবুও প্যান্টশার্ট পরল, বলল, যা হয় হবে। এত তয় পেও না তো। তোমাদের তয় দেখলে আমার রাগ ধরে।

সুরঞ্জন এই কথাটি বলে। বলে কিন্তু বুঝতে পারে ওরা তো আর শখ করে তয় পায় না। চারদিক থেকে যা থবর আসছে তাতে তয় না পাবার কোনও কারণ নেই। সুরঞ্জনেরও কি একটু তয় লাগে না, নিচ্য লাগে। তবু সে বেরোয়। বেরোতে গেলেই সুরঞ্জন অবাক হয় যে পাড়ার একদল ছেলে, ব্যাস বারো থেকে পনেরো মধ্যে, টেক্টিয়ে ওঠে হিন্দু ধর হিন্দু ধর বলে। অথচ এরাই কাজে অকাজে সুরঞ্জনদা এটা করে দিন ওটা করুন বলে বাড়িতে ভিড় করেছে। পাড়ায় ফাংশান করব সুরঞ্জনদা গান গাইবেন, মঝটা ঠিক হল কি না দেখে যাবেন, চাঁদ দিন, একটু দেখিয়ে দিন, একটু বলে দিন। আর এদের আঘায়বজ্জনদের পাড়ার লোক বলে থতির করে ফি চিকিৎসা করে আসছেন সুধাময়, সে অনেক বছর হল। সুরঞ্জন ওদের দিকে তাকিয়ে উঠে পথে হাঁটে। সুরঞ্জন নিজে কোনওদিন ধর্ম মানে না। বাবা শেখায়নি। কিরণময়ী বিয়ের পর পর ঘরে লক্ষ্মীর পট, দুচারটে দুর্গা কালির ছবি টবি নিয়ে একটু আড়াল হত। দেখে সুধাময় বলতেন আমার বাড়িতে ওসব চলবে না বলে দিছি। ব্যাস চলল না। তবে একটা জিনিস বাড়ির সকলে করে, সে হল পুজোর দিন বেশ দল বেঁধে পুজো দেখতে বেরোয়। ময়মনসিংহে দুর্গাপূজা বেশ আঘৰ করা হত সুরঞ্জন ছেটবেলা থেকে বারোয়ারি পূজা উৎসবে মণ্ডপের পেছনে খাটায়াটনি করত। সারাদিন গান হচ্ছে, সে বনুবাবদ নিয়ে হৈ তৈ করেছে, গান শুনছে, প্রসাদ খাচ্ছে, এর ওর বাড়ি গিয়ে নাড়ু খাচ্ছে, লক্ষ্মীপূজোয় সারাবাত জেগে বাড়ি বাড়ি নাবকেল চুবির খেলা খেলছে, অংশীর দিন ব্ৰহ্মপুত্ৰে শ্বান করতে নামছে। এসব কখনও ধৰ্মের অনুভব থেকে সুরঞ্জন করেনি, করেছে উৎসবের আনন্দ থেকে দল বেঁধে। সুরঞ্জন গান শিখেছিল, গলা ছেড়ে আসবে গান গাইত সে, চুয়ান্তরের দুর্ভিক্ষে দলের ব্যানার নিয়ে দল বেঁধে গান গেয়ে গেয়ে বাড়ি বাড়ি টুকু চাল ভাল নিয়ে আসেছিল। বন্যা হলেও দলের কাজ বেড়ে যায়, স্যালাইন বানাও, বিলি কর। এসব কাজে সুরঞ্জন সবার আগে দাঁড়িয়ে যায়।

সুরঞ্জন যখন মতিবিল পার হচ্ছে, হাতের বাঁকিকে হঠাত দেখে পেড়া ইত্তিয়ান এয়ার লাইসের অফিস। আরও সামনে সিপিবি অফিসও পোড়া। সিপিবি অফিসের সামনে ফুটপাতে ভাল ভাল বই নিয়ে বসত দু একজন বিক্রেতা, পুড়ে ছাই করে দিয়েছে সব বই। গতকাল দুপুরে জামাত শিবির যুব-কমান্ডের সন্ত্রাসীরা এই অপকাওগুলো করেছে। এলাকায় চৰম উত্তেজনা, লোকজনের জটলা, কি হয়েছে কি হবে এসব নিয়ে ফিসফিস উত্তেজক কথাবার্তা। সুরঞ্জনের সঙ্গে সিপিবি অফিসের সামনে কায়সারের দেখা হয়। কায়সার কমিউনিস্ট পার্টি করে। সে ভীষণ ক্ষুক হয়ে ছেটাছুটি করছিল। সুরঞ্জনকে দেখে থামে। উদ্বিগ্ন কঠে বলে, তুমি বেরিয়েছ কেন?

সুরঞ্জন হেসে বলে, আমার কি বেরোতে মানা!

- মানা নেই, তবে জানোয়ারগুলোকে তো বিশ্বাস নেই সুরঞ্জন। এরা তো আসলে কোনও ধর্ম মানে না। ধ্বনিতা বিবোধী শক্তিগুলো তকে তকে আছে কোনও একটা ইস্যু তাদের ফেভারে নিয়ে চিকিৎসা করতে। যেন তাদের উচু গুলাটা সবাই শোনে। সুরঞ্জন হাঁটতে থাকে, পাশে কায়সারও। সুরঞ্জন জিজেস করে, আর কোথায় কোথায় আগুন ধৰাল ওরা!

কায়সার তোপখানার দিকে হাঁটে। সুরঙ্গনও। কায়সার বলতে একটু সময় নেয়, কিন্তু বলে—চট্টগ্রামের তুলসীধাম, পঞ্চাননধাম, কৈবল্যধাম মন্দির ধ্বংসস্থূপে পরিণত হয়েছে। তা ছাড়া মালিপাড়া, শাশান মন্দির, কোরবানীগঞ্জ, কালিবাড়ি, চট্টগ্রাম, বিষ্ণুমন্দির, হাজারি লেন, ফকির পাড়া এলাকার মন্দিরের সব লুটপাট করে আগুন জ্বলে দিয়েছে। কায়সার কাঁধ শুগ করে বলে, অবশ্য সাম্প্রদায়িক সম্মুতির মিছিল ও বেরিয়েছে।

সুরঙ্গন দীর্ঘশাস্ত ফেলে, কায়সার উত্তেজিত হয়ে ওঠে, বলে, কাল শুধু মন্দির নয়, মাঝিরঘাট জেলেপাড়ায় আগুন জ্বলে দেয়, অন্তত পঞ্চাশটি ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

তারপর কি হল? সুরঙ্গন নির্বিষ্ট কঠে জিজ্ঞেস করে।

তারপর, তারপর আর কী। নন্দনকানন তুলসীধামের এক সেবক দীপক ঘোষ পালিয়ে যাবার সময় জামাতিরা তাকে ধরে জালিয়ে দেবার চেষ্টা করে। পাশে কয়েকজন দারোয়ান ছিল, ওরা দীপককে মুসলমান এবং তাদের আচার্য পরিচয় দিলে জামাতিরা দীপককে মারধোর করে ছেড়ে দেয়।

সুরঙ্গন হাঁটতে হাঁটতে প্রেসক্লাবের সামনে এসে দাঁড়ায়। অনেকে যারা পরিচিত, তাকে দেখে চমকে ওঠে। কী ব্যাপারে আপনি বা তুমি এখানে কেন? বিপদ হতে পারে। ঘরে চলে যাওয়া উচিত; সুরঙ্গনের বড় অপ্রতিভ লাগে। তার নাম সুরঙ্গন দন্ত বলে তাকে ঘরে শিয়ে লুকাতে হবে আর কায়সার, লুৎফর, হেলাল, শাহীনদের ঘরের বাইরে বের হলে কোনও অসুবিধে হবে না। অথচ ওরা একই রকম প্রগতিশীল, একই বিশ্বাসে ওরা মনে ও মননে বেড়েছে। সুরঙ্গন বেশ উদাস দাঁড়িয়ে থাকে, সিগারেটের দোকানে একটি বাংলা ফাইট চায়, প্যাস দিয়ে আগুনমুখো দড়ি থেকে সিগারেট ধরায়। সিগারেটে টান দিয়েও তার ভঙ্গি পরিবর্তিত হয় না।

গুঞ্জন বাড়ছে। জটলা বাড়ছে সাংবাদিকদের। সকলের মুখে এক প্রসঙ্গ। বাবরি মসজিদ। ভারতে এ পর্যন্ত দুশ্র ওপর লোক দাদায় নিহত হয়েছে। আহত কয়েক হাজার। আর এস এস শিবসেনাসহ মৌলবাদী দলগুলো নিয়ন্ত। লোকসভায় বিরোধী নেতার পদ থেকে আদভানির পদত্যাগ। সুরঙ্গন এসব আলোচনা থেকে নিজেকে বড় বিচ্ছিন্ন বোধ করছে কি? বোধহয় করছেই। তা না হলে তার বাবরার দীর্ঘশাস্ত পড়ছে কেন? সুরঙ্গন লক্ষ্য করে, তাকে সকলেই আড়াল করছে, করণা করছে, তাকে দলে নিছে না, তারা মিছিল করবে, আন্দোলন করবে সাম্প্রদায়িকতার বিক্রকে, অথচ সেই দলে সুরঙ্গনের তো থাকাটা স্বাভাবিক কিন্তু সুরঙ্গন নিজেও যেন অনেকটা মিশে যেতে পারছে না কায়সার বা লুৎফরদের দলে, তবে কি একথা সত্য যে ভারতের বাবরি মসজিদ ভাঙা এবং সেই সুন্দ্র ধরেই এদেশের মন্দির ভাঙা— এই ঘটনার সঙ্গে লুৎফর এবং সুরঙ্গনের মধ্যে অদৃশ্য একটি দেওয়াল দাঁড়িয়ে গেছে। লুৎফর তার চেয়ে কম মেধাবি ছেলে। তাকে একদিন একটি পত্রিকা অফিসে নিয়ে গিয়ে পরিচিত সম্পাদককে বলে কয়ে সুরঙ্গন চাকরি নিয়ে দিয়েছিল। সেই লুৎফর সুরঙ্গনের বাড়ি প্রায়ই বসে থাকে। সুরঙ্গন আজ লক্ষ্য করছে, লুৎফর যেন তাকে করণা করছে। লুৎফর এগিয়ে এসে চোখে মুখে উৎকর্ষ, বলে, সুরঙ্গনদা, বাড়িতে কোনও অসুবিধে হয়নি তো?

সুরঙ্গন হেসে বলে, কি অসুবিধে?

লুৎফর একটু অপ্রতুত হয়ে বলে, কি আর বলব সুরঙ্গনদা।

লুৎফর অন্য সময় সুরঙ্গনের সঙ্গে নিচুকষ্ট কথা বলত। এবার গলাটা তার উচু। সে একটি সিগারেট ঠোঁটে চেপে বলে, দাদা আপনি বৰং আজ অন্য কোথাও থাকুন, বাড়িতে থাকাটা ঠিক হবে না। এরপর খানিক ভেবে কপাল কুঁচকে বলে, আজ্ঞা সুরঙ্গনদা আপনার বাড়ির আশেপাশে কোনও মুসলমানের বাড়িতে অস্ত দুটো রাত থাকার ব্যবস্থা করা যায় না?

সুরঙ্গনের কঠে নির্বিষ্ট। সে লুৎফরের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। বলল—না।

না? লুৎফর এবার আরও একটু চিহ্নিত হল।

সুরঙ্গন খুব মনোযোগ দিয়ে সিগারেটে টান দিল।

লুৎফর ভাবছে। তার ভাববার ভঙ্গিতে এক ধরনের অভিভাবক আছে। সুরঙ্গনের মনে হয়, এখন যে কোনও বিষয়ে কথা বলতে গেলেই যে কেউ এরকম অভিভাবক দেখবে, এবং না চাইতে আগ বাড়িয়ে উপদেশ দেবে। সুরঙ্গন তাই সহজ হতে পারে না। সে সিদ্ধান্ত নেয় সে একা বসে থাকবে কোথাও। এক বদ্ধুইন, আচার্যাইন, কোনও নির্ভর জায়গায়। কোথায় এমন জায়গা এই ঢাকা শহরে?

লুৎফরের প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে সুরঙ্গন বেরিয়ে এল রাত্তায়, হাঁটতে লাগল সেগুন বাগিচার দিকে, সেগুনবাগিচা এজিবি অফিসের পাশ দিয়ে কাকরাইলে উঠল, হাঁটতে হাঁটতে সে ডানে লক্ষ্য করল 'জলখাবার' নামের একটি দোকান ভাঙা, ভেতরের আসবাবপত্র বাইরে রাস্তা, আগুন ধরানো। 'জলখাবার' পুড়িয়েছে কারণ এটা হিন্দুর দোকান। সুরঙ্গন শুনেছে মরণটাও ভেঙে নাকি চুরমার করেছে। সব মিঠির দোকান ভাঙা হচ্ছে। কারণ কি ধর্মীয় দ্বন্দ্ব? নাকি মিঠি খাওয়া, লুটপাট? সুরঙ্গনের মনে হয় ধর্মের চেয়ে হাতের থাবাটি এখানে বড়। নবকাঁ-এ লুট হয়েছিল ঘরবাড়ি সোনার দোকান। ধার্মিকেরা কি কখনও পারে বিধৰ্মীর সম্পদ লুট করে নিজের ধর্ম রক্ষা করতে? এ তো আসলে ধার্মিকের কাজ নয়, এ হচ্ছে গুণ্ডা বদমাশদের কাজ। গুণ্ডা বদমাশরা সুযোগ পেলেই থাবা দেয়, আর সবলেরা দুর্বলের ওপর আঘাত তো করবেই।

শহর সাংগতিক ধর্মথামে। বায়তুল মোকাররম এলাকায় উত্তেজনা, জামাত-শিবির যুবকমান সন্ত্রাস করছে দেশ জুড়ে। পুলিশ গুলি ছুঁড়লে একজন মারা ও যায় ঢাকায়। দেশে ঘাতক দালাল নির্মল কমিটির আন্দোলন যখন তুম্পে তখন আচমকা বাবরি মসজিদ প্রসম্পটি এল; সুযোগ নিল দেশের স্বাধীনতা বিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তি। সুরঙ্গন চামেলিবাগে পুলকের বাড়িতে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। পুলকের বাড়িতে সে গত দেড় বছর যায়নি। পুলক নিজে দরজা খোলে, সুরঙ্গনকে ভেতরে ঢুকিয়ে সে বলে, সারাদিন ঘরে বসে আছি। নীলা তো ভয়ে কাঁপে।

সুরঙ্গন সোফায় বসে চোখ বন্ধ করে। সে ভাবছে পাশে রফিকের বাড়ি না গিয়ে সে আজ পুলকের বাড়ি এল কেন, রফিকের সঙ্গে তার বদ্ধুত্ব বেশি। সে কি ভেতরে ভেতরে

কম্যুনাল হয়ে উঠছে, নাকি পরিস্থিতি তাকে কম্যুনাল করছে। পুলকের ছেলে অলক কাঁদছে। পুলক বলল, ও কাঁদছে কেন জান? এতকাল সে পাশের ফ্ল্যাটের সমবয়সী বাচ্চাদের সঙ্গে খেলেছে। কাল থেকে রবিন, মিশক, পেলাশ ওকে খেলায় নিছে না। বলছে তোমাকে খেলায় নেব না, হজুর বলেছে হিন্দুদের সঙ্গে না মিশতে।

হজুর মানে? সুরঞ্জন প্রশ্ন করল।

হজুর হচ্ছে সকালে মৌলভী আসে আরবি পড়াতে, সেই লোক।

পাশের ফ্ল্যাটে আনিস আহমেদ থাকে না? সে কমিউনিটি পার্টি করে সে তার বাচ্চাদের হজুর দিয়ে আরবি পড়ায়?

হ্যাঁ। পুলক বলে।

নীলা এল। নীলাকে, পুলককে, পুলকের ছেলে অলককে তার বড় আপন মনে হচ্ছে। বড় কাছের মানুষ। নীলা পাশের সোফায় বসে অনুযোগ করল সুরঞ্জনদা, কতদিন আসেন না, খবর নেই না বেঁচে আছি কি মরে গেছি জানতেও আসেন না। খবর পাই পাশের বাড়িতেই আসেন। বলতে বলতে নীলা হঠাৎ কেঁদে উঠে। নীলা কাঁদছে কেন, সম্ভবত ও খুব অসহায় বোধ করছে। বেলালের বাড়িতে চার পাঁচদিন আগেও আড়া দিয়েছে সুরঞ্জন, এ বাড়িতে আসেনি। সুরঞ্জন নীলার দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি এত নার্ভাস হচ্ছ কেন? ঢাকায় বেশি কিছু করতে পারবে না ওরা। পুলিশ পাহারা আছে শাখারিবাজারে, ইসলামপুরে, তাঁতিবাজারে।

পুলিশ তো গতবারও দাঁড়িয়ে ছিল, তারা ঢাকেঝির মন্দির লুট করল, আগুন ধরাল পুলিশের সামনে, পুলিশ কিছু করল? জলখাবার পুড়িয়ে দিয়েছে দেখেছেন।

হ্যাঁ।

আপনি রাত্তায় বেরোলেন কেন? কোনও বিশ্বাস নেই মুসলমানদের। ভাবছেন বদ্রু, দেখবেন সেই আপনাকে গলা কেঁটে ফেলে রাখল।

পুলকের বাড়িতে ফোন আছে। সুরঞ্জন হিন্দু বন্ধুবাক্ষৰ, চেনা অঞ্জচেনা অনেককে ফোন করে, দিলীপ দেকে জিজেস করে আছেন কেমন, কোনও অসুবিধে নেই তো? দিলীপ দে বললেন, অসুবিধে নেই কিন্তু মনে স্বত্ত্ব পাচ্ছি না।

পুলক বলে, দেববৃত্ত খবর নাও তো। দেববৃত্ত ওই এক অবস্থা, এখনও হয়নি কিছু, কিন্তু হতে কতক্ষণ। স্বত্ত্ব পাচ্ছি না।

মহাদেব ভট্টাচার্য, অসিত বর্ধন, নির্মল সেনগুপ্ত, সজল ধর, মাধবী ঘোষ, কুস্তলা চৌধুরী, সরল দে, নিখিল সাম্মান, রবীন্দ্র গুপ্ত সকলের খবর নিতে সুরঞ্জনের ভাল লাগে— এতদিন পর পরিচিত অনেকের সঙ্গে কথা হয়, এক ধরনের আর্যায়তা ও অনুভূত হয়।

নীলা চা আনে। চা খেতে খেতে মায়ার কথা ওঠে। মায়াকে নিয়ে দুশ্চিন্তা হয় সুরঞ্জনের। সে যদি ছট করে একদিন জাহাসীরকে বিয়েই করে বসে, তখন উপায় কী হবে? সুরঞ্জন ভাবে মায়াকে পারলের বাড়ি থেকে যাবার পথে বাড়ি নিয়ে যেতে হবে। ওখানে থেকে ওই ছেলের সঙ্গে যোগাযোগে ওর বেশ সুবিধে। দুঃসময়ে মানুষ যে কোনও সিদ্ধান্ত ঘট করে নিয়ে ফেলে।

পুলকের এর মধ্যে ফোন আসে। ফোনে কথা সেরে পুলক জানায় কঞ্চিবাজারে জামাত শিবিরের লোকেরা জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে দিয়েছে। সুরঞ্জন শুধু শোনে এবং নিজের নিলিঙ্গ দেখে নিজে সে অবাক হয়। সে অন্য কথনও এই খবর শনে ক্ষেত্রে ফেটে পড়ত। আজ মনে হচ্ছে এই পতাকা পুড়ে গেলে তার কিছু যায় আসে না। এই পতাকা তার নয়। সুরঞ্জনের এমন হচ্ছে কেন? সে আজ হরতালের সন্তানের শহরে একা একা হেঁটে বেড়িয়েছে, বেড়িয়েছে সুরঞ্জন দণ্ড নাম নিয়ে, কোনও মহীউদ্দিন বা আবদুল মালেক নামে নয়। সে পার হয়ে এসেছে, তার শরীরের কোথাও আঁচড় লাগেন। কিন্তু আঁচড় বা আঘাত বা মৃত্যু কি এসে উপস্থিত হচ্ছে না দেশের আর সব সুরঞ্জনদের ওপর? সুরঞ্জন কেন তার দায় নেবে না? হিন্দু-বৌদ্ধ-ত্রিস্টান এক্য পরিষদের সদস্য কাজল দেবনাথ তার চেনা। একবার তাবে কাজলকে বলে সুরঞ্জন নাম লেখাবে ওই দলে। অবশ্য কথনও সে ওই দল করবার পক্ষপাতি ছিল না। কারণ দলে মুক্ত চিত্তার সুস্থ চিত্তার অসাম্প্রদায়িক মুসলমানদের সঙ্গে না নেবার কারণ দেখে না সুরঞ্জন।

পুলক তার ঘনিষ্ঠ বসে, বলে, আজ আর যেও না। এখানেই থেকে যাও। এ সময় আমাদের কার্যের রাস্তায় বেরোনটা ঠিক নয়।

পুলকের এই বাক্য লুৎফরের বাকের সঙ্গে মিলে যায়। কিন্তু সুরঞ্জন অনুভব করে পুলকের কঠিন আন্তরিকতা আছে, আর লুৎফরের কঠিন কোথায় যেন সূক্ষ্ম অহংকার বা উক্তিত্ব আছে। অথবা নেই, কিন্তু সংখ্যালঘুর যন্ত্রণা সংখ্যালঘু ছাড়া আর কেউ তেমনভাবে অনুভব করতে পারে না বলেই লুৎফরের পরামর্শ সুরঞ্জনের গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি।

নীলা বলে, দেশে আর থাকতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। আজ হয়ত কিছু হচ্ছে না, কাল হবে, পরও হবে। অনিচ্ছিত জীবনের চেয়ে নিশ্চিত দরিদ্র জীবন অনেক ভাল।

সুরঞ্জন নীলার এই সিদ্ধান্তে আপত্তি করে না। পুলকও করে না।

পুলকের প্রত্বাবে সুরঞ্জন রাজি হত। কিন্তু সুধাময় কিরণময়ী দুজনে তার জন্য দুশ্চিন্তা করবে বলেই তাকে বাড়ি ফিরতে হবে। রাত আটটা অবধি পুলকদের সঙ্গে কঠিনে সুরঞ্জন একটি রিপ্লা নেয়। পুলক তার বিশ্ববিদ্যালয়ের বদ্রু। এখন ব্যবসা করে। বিয়ে থা করে ছেষ্টি সংসার নিয়ে বেঁচে আছে। সুরঞ্জনেরই কেবল সংসার হল না। বয়স অনেক হয়ে গেছে। এই বয়সে কি আর বিয়ে হয়। রত্না নামে একটি মোয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে একমাস হল। মেয়েটি একটি এনজিওতে কাজ করে। রত্না একদিন কথায় কথায় জিজেস করেছিল এখন করছেন কি?

কিছু না।

চাকরি বাকরি ব্যবসা বাণিজ্য, কিছু না?
না।

রাজনীতি করতেন, সেটা?

ছেড়েছি।

যুব ইউনিয়নের সদস্য ছিলেন জানতাম।

ওসব আর ভাল্লাগেনা।

বিয়ে করেননি কেন?

কেউ পছন্দ করেনি বলে।

কেউ না?

একজন করত। সে রিক্ষ নেয়নি আলটিমেটলি।

কেন?

সে মুসলমান ছিল, আর আমাকে তো বলা হয় হিন্দু। হিন্দুর সঙ্গে বিয়ে, ওকে তো আর হিন্দু হতে হত না। আমাকেই আবুসুস সবুর নাম রাখতে হত। রহস্য হেসেছিল শুনে, বলেছিল বিয়ে না করাই ভাল, কদিনের মাত্র জীবন, বন্ধনহীন কাটিয়ে যাওয়াই তো ভাল।

তাই বুঝি আপনিও ওপথ মাড়াচ্ছেন না।

ঠিক তাই

রহস্য সঙ্গে সংলাপগুলো সুরঞ্জন আবার পাড়ে। মনে মনে। টিকটুলির দিকে রিঙ্গাকে না গিয়ে পলাশি ঘুরে যেতে বলে। পলাশিতে থাকেন নির্মলেন্দু গুণ, কবি। তাঁর কী অবস্থা একবার দেখে যাওয়া উচিত। রহস্যাই বা কেমন আছে, কে জানে। আজিমপুর থাকে, যাবে একবারঃ গিয়ে জিঞ্জেস করবে আপনি ভাল আছেন রহস্য মিত্র? সুরঞ্জন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সাম্প্রদায়িক সন্তানের কারণে এক ধরনের হিন্দু পুনর্মিলনী হচ্ছে, তা অনুমান করে সুরঞ্জন। রহস্য বাড়িতে এসময় উপস্থিত হলে রহস্য নিশ্চয় অবাক হবে না, ভাববে এ সময় সবাই উচিত সবার দৃশ্যময়ে সঙ্গী হওয়া।

পলাশিতে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির কর্মচারীদের জন্য কলোনী আছে। ওর একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকেন কবি নির্মলেন্দু গুণ। দরজায় টোকা দিলে দশ বারো বছরের একটি মেয়ে দরজা খুলে দেয়।

নির্মলেন্দু গুণ বিছানায় বসে টেলিভিশন দেখছিলেন। সুরঞ্জনকে দেখেই বললেন, এস, আছ কেমন?

এখন অবধি বেঁচে আছি। সুরঞ্জন বলে। আপনি যে না দেখেই দরজা খুলে দিলেন? যদি জামাতিরা মারতে আসত।

গুণ হেসে বললেন— আসবে, কথা বলব, আমার সঙ্গে কথোপকথনে গেলেই কন্ভিনসড হবে। বরং তাদেরই তখন আমি ধরক দিয়ে বিদায় করতে পারব। কাল রাত দুটোর সময় কিছু ছেলে রাস্তায় জমা হয়ে মিছিল করবার প্লান করছিল, হাঁক দিলাম, ওখানে চিৎকার করছে কারা? ব্যস চলে গেল দূরে। আর আমার ছল দাঢ়ি দেখে তো অনেকে ভাবে আমি মুসলমান মৌলভী।

গুণ হাঁক দিলেন, গীতা চা দে।

দু কাপ চা এল। চা থেতে থেতে গুণ বললেন, আমি তো বিছানা থেকে মামি না। কেন?

ভায়ে। মনে হয় বিছানা থেকে নামলেই ওরা বোধহয় ধরে ফেলবে।

দিনবাত দরজা বন্ধ করে বনে আছেন তাহলে?

বিছানায় বসে থাকি। দরজা খোলা থাকে দিনে। আর রাতে কেউ এলে সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিই, জিঞ্জেস করি না কে।

কেন?

বোঝাবার জন্য যে আমি ভয় পাচ্ছি না।

সুরঞ্জন হেসে উঠল। এই কবির মধ্যে অসম্ভব আমুদে একজন মানুষ বাস করে।

গুণ বললেন, তুমি যে অন্যের খোঁজ খবর নিয়ে বেড়াচ্ছ। তোমার নিজের নিরাপত্তা আছে তো? সুরঞ্জন ভাবল, তার নিরাপত্তা আদো আছে কি না। টিকটুলির বাড়িতে বাবা মা বনে আছেন দুচিত্তায়, যয়ে নিরাপত্তাহীনতায় তাঁদের মীল হয়ে আছে মুখ, সুরঞ্জন জানে না এর মধ্যে বাড়ির জিমিসপ্ত্র লুট করে বাড়িটিতে কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কি না। দিতে পারে, অসম্ভব কিছু নয়। সুরঞ্জনের মনে হয় এই দেশের জন্য এখন কিছুই আর অসম্ভব নয়।

নির্মলেন্দু গুণ আছেন বেশ। আমেরিকার লস লাসেডেগামের ক্যাসিনোয়ে বনে জ্যো খেলতে পারেন, আবার পলাশীর বাস্তিতে বনে মশার কামড়ও থেতে পারেন। কিছুতেই আপত্তি নেই, বিরক্তি নেই তার। গুণদাই ভাল লোক, যে কোনও পরিবেশে তিনি চমৎকার হাসতে পারেন, হাসাতে পারেন। এতে অল আনন্দে তিনি তেসে থাকেন কী করে সুরঞ্জন ভাবে। আসলেই কী আনন্দ, নাকি বুকের ভেতর তিনিও গোপনে খুব দুঃখ পোবেন, কিছুই করবার নেই বলে হেসে পার করেন দুঃসহ সময়।

পারুলের বাড়ি, রহস্য বাড়ি কোথাও আর যেতে ইচ্ছে করে না সুরঞ্জনের। সে উদাসিন হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফেরে। বাড়িতে চুকে অতুল এক ব্যাপার লক্ষ্য করে সুরঞ্জন, কিরণময়ী ঘরের কোণে ধোয়া জলচৌকিতে একটি ঠাকুর বসিয়ে ঠাকুরের পায়ের কাছে গলায় আঁচল জড়িয়ে মেঝেয় মাথা টুকচে, সুরঞ্জন ঘরে চুকে অবাক হয়ে প্রশ্ন করে এসব কী হচ্ছে মা?

কিরণময়ী চিৎকার করে কেন্দে ওঠে ভগবান, ভগবান বলে। কিরণময়ী ভগবানকে ডাকছে। সুরঞ্জন এমন দৃশ্য কখনও তাদের বাড়িতে দেখেনি। এসব কপাল ঠোকাঠুকি দেখলে সুরঞ্জনের গা ঘিন ঘিন করে।

সুরঞ্জন কিরণময়ীর দুঁবাহ ধরে দাঁড় করায়, বলে হয়েছে কি তোমার, বল? কাঁদছ কেন? আর এইসব মৃত্তি নিয়ে বনেছ কেন, মৃত্তি তোমাকে বাঁচাবে?

কিরণময়ী কাঁদতে কাঁদতে বলে, তোর বাবার ডান হাত পা অবশ হয়ে গেছে, কথা জড়িয়ে আসছে।

সঙ্গে সঙ্গে সুধাময়ের দিকে চোখ ফেরায় সুরঞ্জন, শয়ে আছেন, অফিল শরীর, কথা বলছেন কিন্তু বোধ্য যাচ্ছে না কি বলছেন।

সুরঞ্জন সুধাময়ের কাছ দেখে বসে ডান হাতটি ধরে বুকতে পারে সুধাময়ের হাতে কোনও চেতন নেই, শক্তি নেই। বুকের খোপে কুড়োনের একটি কোপ পড়ে সুরঞ্জনের। যা হবার, তা হয়েই গেছে। এখন ডাঙ্কার ডাকলেই বা কী, ডাঙ্কার বলবেন এখন শুধু শয়ে থাকতে হবে আর ফিজিওথেরাপি দিতে হবে। সুরঞ্জনের দানুর ট্রোক হয়েছিল, ঠিক একই রকম, সুরঞ্জন পাশে ছিল, সে জানে ঠিক এই এই হয়। গ্রাউ প্রেসার দেখে প্রেসার কমানোর ওষুধ খেতে দেয় ডাঙ্কার নিয়মিত। কিন্তু অবশ হাত পা দ্রুত ভাল করে দেবার কোনও ওষুধ নেই।

সুরঞ্জন বড় ছেলে, দায়িত্ব তার কাঁধেই বর্তাবে। এই সংসারকে সচ্ছল বলা যাবে না। সুরঞ্জনের কোনও চাকরি স্থায়ি হয়নি। এখনও সুধাময়ের পেনশনের টাকায়, জমানো টাকায়, বাড়িতে কিছু রোগী দেখবার টাকায় সংসার চলে। মায়া দুটো টিউশনি করে, তাতে মায়া নিজের হাতখরচ চালায়। কেবল সুরঞ্জনই অকর্ম্য। অথচ এই সংসারের হাল তারই ধরবার কথা। এখন কী হবে, ঘরে বসে রোগী দেখেও যা উপার্জন হত সেটি ও তো বক। মামা মাসিরাও নেই, এক এক করে সবাই দেশ ছেড়েছে। দূর সম্পর্কের যারা আছে, তারা নিজেরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে কামাল বা ওরা কেউ এনেছিল?

কিরণময়ী বলে, না।

কেউ একবার খোজ নিতে আসেনি সুরঞ্জন কেমন আছে। অথচ শহরে হেঁটে ঘুরে সুরঞ্জন সবার পৌঁজি নিয়ে এল। সকলে ভালই আছে, কেবল সুরঞ্জন ছাড়া। সুধাময় যে সম্পর্কে তার কেউ হয়, সুধাময়ের অসুস্থতার পরই সুরঞ্জন তা অনুভব করে। মানুষটি বড় ভাল ছিল। বড় মায়া হয় তাঁর জন্য সুরঞ্জনের। সুরঞ্জন এখন হরিপদ ডাঙ্কারকে ডাকতে যাবে, তাঁর বাড়ি রাস্তার শেষ মাথায়। তিনি কি আসবেন এ বাড়িতে? সুরঞ্জনের নদেই হয় এই রাতে সারা দেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস— এ সময় কি হরিপদ কাকা বেরোবেন রোগী দেখতে, হোক না সুধাময় তার একসময়ের বক্স, এখন তো রোগীই।

মায়া কেরেনি? সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে।

কিরণময়ী জবাব দেয়, না।

কেন কেরেনি মায়া? সুরঞ্জন হঠাতে চিকার করে ওঠে। কিরণময়ী অবাক হয়। সুরঞ্জন খুব চুপচাপ ন্যূ ন্যূ ভাবের ছেলে, মাথা গরম করে কথা বলে না, আজ হঠাতে চেঁচিয়ে উঠল কেন? মায়া পারলেন বাড়ি গিয়েছে, এ এমন কোনও অন্যায় কাজ নয়, বরং এ অনেকটা নিশ্চিতের, কারণ এটা হিন্দু বাড়ি। যারা লুট করতে আসবে, মায়াকে দেখে তাকেও লুট করতে পারে। এ তাদের জন্য ডালভাত। মেয়েরা তো সম্পদের মত। লুটেরাবা সোনাদানা নিয়ে যায়, আর নিয়ে যায় মেয়ে।

সুরঞ্জন দুটো ঘরের মধ্যে পায়চারি করে আর আক্ষুণন করে— কেন যাবে মায়া? আমাদের ওপর সে ভরসা হারিয়ে কেলেছে?

মুসলমানরা তাকে ক'দিন বাঁচাবে? মুসলমানদের এত বিশ্বাস কেন ওর?

কিরণময়ী অবাক চোখে তাকায় সুরঞ্জনের দিকে। সুরঞ্জনের তামা আর অচরণ সবই অচৃত লাগে কিরণময়ীর কাছে। বাবা তার অসুস্থ, প্যারালাইসিস হয়ে গেছে। আর সে মায়া কেন মুসলমানের বাড়ি গেল, এ নিয়ে রাগরাগি করছে। কিরণময়ী বলে, আমি যাচ্ছি ডাঙ্কার আনন্দে।

দাঁড়াও। আবার চেঁচিয়ে ওঠে সুরঞ্জন।

কিরণময়ী থামে। ভেবেছ কি? আমি বসে থাকব, আর তুমি ডাঙ্কার ডাকবে? ভাবছ টাকাকড়ি কিছু নেই, বেকার হেলে—এর দ্বারা কী আর হবে?

না সুরঞ্জন না। তোর বাবা.....

রাখ। বাবা! পাড়ার দুটো পিচি ছেলে তোমাদের ভয় দেখাল আর সেই ভয়ে চালিশ লক্ষ টাকার বাড়ি চালিশ হাজারে বিক্রি করেছে, এখন ভিস্কুটের মত বাঁচ, লজ্জা করে না!

কথাগুলো সুরঞ্জন চিকার করে বলে। সুধাময় বাঁ হাত তুলে শাস্ত হতে বলে সুরঞ্জনকে।

বারান্দায় একটি চেয়ার ছিল, সুরঞ্জন সেটিকে লাথি মেরে সরিয়ে দেয়।

আর মেয়ে গেছে মুসলমানকে বিয়ে করতে। ভেবেছে মুসলমানরা তাকে বসিয়ে বিয়ে করাবাবে, মেয়ে বড়লোক হতে চায়।

সুরঞ্জন! কিরণময়ীও সমান তালে চেঁচায়।

সুরঞ্জন বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। সে ডাঙ্কার ডাকবে, হরিপদ, না সামাদ? কাকে ডাকবে? ভাবতে ভাবতে সে হরিপদের বাড়িতে যায়। হরিপদ নেই। দরজায় তালা। ডাঃ সামাদ বাড়িতে আছেন। তিনি দয়া করে এলেন, দেখলেন! ফিস দেয় সুরঞ্জন, ডাঃ সামাদ সেঁ: ফিস পকেটে পুরলেন। বাহ এইতো মেডিকেল এথিক্স। ডাঙ্কারের অসুখে ডাঙ্কার নিষ্ঠে ডাঙ্কারের কাছ থেকে টাকা। সুরঞ্জন মান হাসে। গ্রাউ প্রেসার এখন ঠিক আছে সুধাময়ের। ট্রোক হয়েছে, প্রেসার বেড়েছিল, তাই, এখন শাস্ত থাকতে হবে। বিছানায় বেড প্যান ব্যবহার করতে হবে, উঠতে চাইলে পড়ে যাবার আশঙ্কা আছে। সুধাময় সব বুঝলেন, চোখ বক করে শয়ে রাইলেন। তিনি এখন বিয়য় নয় কোনও কিছু। তিনি এখন এই সচল প্রথমী থেকে কিছুটা আচল বৈকি, কিছু অগ্রয়োজনীয়ও।

এখন কোন প্রশ্নটি আগে আসে— এই বাড়িটি হিন্দুর না এই বাড়িতে একজন অসুস্থ মানুষ আছে, কোনটি? হিন্দুর বাড়ি হলে যে কোনও সময় আক্রমণের ভয় আর অসুস্থ হলে ভয় যে কোনও সময় আরও বেশি অসুস্থতার। কোন ভয়টি আগে দূর করবে সুরঞ্জন?

আক্রমণের ভয় থেকে আপত্তি সে উদ্ধার পাচ্ছে না; কারণ কামাল আসেনি এবার একবারও বৌজ নিতে। কারও বাড়িতে যাবার প্রশ্ন ওঠে না। আর সুধাময়ের চিকিৎসা করাতে এখন সুরঞ্জনের সহল যা আছে তাই উপুড় করে দেখতে হবে হয় কিনা। ফিজিওথেরাপির ডাক্তার এসে প্রতিদিন এক্সারসাইজ করিয়ে যাবে, টাকা নেবে একশ। প্রতিদিন একশ টাকা কি সত্ত্ব হবে দেওয়া? সুরঞ্জনের ইচ্ছে হয় এটিকে সত্ত্ব করবার। তার একটি চাকরি হলে সত্ত্বত মাথার ভেতর বনবন করে উড়ে বেড়াত না দুর্চিন্তার বোলতা। সুরঞ্জন দিন দিন বড় একা হয়ে যাচ্ছে। সুরঞ্জন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াত, সংসারবৃদ্ধি তার হয়নি কখনও, ইচ্ছে করেই সে বৈষয়িক ইওয়া থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছে; কারণ সবসময় অনুভব করেছে দীশ্বরের মত একটি উদার অতিভুক্তে, সুধাময়কে। যেন যে কোনও দুষ্টিনায়, দারিদ্র্য সুধাময়ই তাকে রক্ষা করবে। তার মনে হয়নি মানুষ দিন দিন বৃক্ষ হচ্ছে, বয়সের ভাবে ন্যূজ হচ্ছে, জগতের সকল কিছু থেকে আস্থা হারাচ্ছে, তাকে একটু সঙ্গ দেওয়া উচিত ছিল, উচিত ছিল তার বক্তৃ ইওয়া। সুরঞ্জনের গ্লানিই হচ্ছে, নিজের প্রতি গ্লানি। মায়াটাই বা কী। এখনও সে খবর পেল না, সুধাময়ের স্ট্রেক হয়েছে, 'এখনও সে কি তার বাক্সবীদের সঙ্গে আড়তা নিচ্ছে? হেসে বেড়াচ্ছে, নাকি জাহাঙ্গীরের সঙ্গে ডেটিং গেছে? সুরঞ্জনের আশংকা মায়া বেঁচে থাকবার প্রচণ্ড লোভে ফিরোজা বেগম জাতীয় কিছু একটা হয়ে যাবে। সেলফিস।

৩

হায়দার এসেছে সুরঞ্জনের বাড়িতে। কেমন আছে জানতে নয়, স্বেচ্ছ আড়তা দিতে। হায়দার আওয়ামী লীগ করে। একসময় সুরঞ্জন তার সঙ্গে ছোটখাট বাণিজ্য করতে নেমেছিল, উন্নতির সংগ্রহ করে আসে বলে শেষ অব্দি বাদ দিতে হয়েছে পরিকল্পনা বা প্রকল্পটি। হায়দার ফাঁক পেলেই রাজনীতির প্রসঙ্গ তোলে। সুরঞ্জন আজকাল রাজনীতি নিয়ে মুখ খুলতে রাজি নয়। এরশাদ কি করেছিল, খালেদা কি করছে এসবের বিশ্লেষণ করবার চেয়ে সুরঞ্জনের মনে হয় ভাল একটি বই পড়া তারা চেয়ে অনেক ভাল। তবু হায়দার বক বক করছেই, রাজনীতি তার প্রিয় এবং একমাত্র বিষয়, সে এ বিষয় ছাড়া আর কোনও বিষয়ে কথা বলতেই সত্ত্বত জানে না। হায়দার রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম নিয়ে লম্বা একটি বক্তৃতা দেয়। আস্থা হায়দার, সুরঞ্জন তার ঘরে, বিছানায় আধ শোয়া হয়ে প্রশ্ন করে তোমাদের রাষ্ট্রের বা সংসদের কি অধিকার আছে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবার? হায়দার চেয়ারে বনে টেবিলে পা তুলে দিয়ে সুরঞ্জনের লাল মলাটের বইগুলোর পাতা ওল্টাচ্ছিল। সে ঠাঁ ঠাঁ করে হেসে ওঠে, বলে, 'তোমাদের রাষ্ট্রে' মানে? রাষ্ট্র কি তোমারও নয়?

সুরঞ্জন ঠাঁট চেপে হাসে, বলে আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করব প্রশ্নগুলোর জবাব তোমার কাছে চাইছি।

হায়দার এবার সোজা হয়ে বনে বলে তোমার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে— না। অর্থাৎ রাষ্ট্রের কোনও অধিকার নেই বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবার। সুরঞ্জন সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন করে— রাষ্ট্রের বা সংসদের কি অধিকার আছে কোনও ধর্মকে অন্য ধর্মের চেয়ে প্রাধান্য বা বিশেষ অনুকূল্য দেখিবার?

হায়দার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দেয়— না।

সুরঞ্জন তৃতীয় প্রশ্ন করে সংসদের কি অধিকার আছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধানে বর্ণিত অন্যতম মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পরিবর্তনের? হায়দার চায় বুজে মানোযোগ দিয়ে কথা ক'টি শোনে, বলে—নিশ্চয়ই না।

সুরঞ্জন আবার প্রশ্ন করে, দেশের সার্বভৌমত্ব সকল মানুষের সমান অধিকারের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। সংবিধান সংশোধনের নামে সেই ভিত্তিমূলেই কি কৃষ্ণাগাত করা হচ্ছে না?

হায়দার এবার তাকায় সুরঞ্জনের দিকে। সুরঞ্জন ঠাঁটা করছে না, সে সিরিয়াসলি কথা বলছে।

সুরঙ্গন তার ষষ্ঠ প্রশ্ন করে, রাত্রীয় ধর্ম ইসলাম মোহগার মাধ্যমে অন্যান্য ধর্মাবলয়ী জনগোষ্ঠীকে রাত্রীয় আনুকূল্য বা স্থীরতি থেকে বর্ণিত করা হয় না কি?

হায়দার কপাল কুঁচকে বলে, হয়। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সব জানা সুরঙ্গনের হায়দারেরও। সুরঙ্গন জানে হায়দার আর সে এসবের উত্তরের ব্যাপারে একমত। তবু প্রশ্ন করবার অর্থ কি এই যে, হায়দার ভাবে, সুরঙ্গন হায়দারকে একটি বিশেষ সময়ে প্রশ্ন করে পরীক্ষা করে হায়দার ভেতরে ভেতরে সামান্য ও সাম্প্রদায়িক কি না, তাই অষ্টম সংশোধনীর প্রসঙ্গ ঠায় সে এই প্রশ্নগুলো করে।

সুরঙ্গন তার সিগারেটের শেষ অংশটুকু এ্যাশট্রেতে চেপে বলে আমার শেষ প্রশ্ন বৃটিশ ভারতে ভারতবর্ষ থেকে আলাদা হয়ে ভিন্ন রাষ্ট্র সৃষ্টির কারণে প্রবর্তিত বিজ্ঞাতিতত্ত্বের জটিল আবর্তে বাংলাদেশকে আবার জড়িয়ে ফেলার এ অপচোটা কেন এবং কাদের খার্দে? হায়দার এবার কোনও উত্তর না দিয়ে একটি সিগারেটে ধরায়, ঝোঁয়া ছেড়ে বলে, জিনাহ নিজেও কিন্তু বিজ্ঞাতিতত্ত্বকে রাত্রীয় কাঠামো হিসেবে ধ্যায়ান করে বলেছিলেন—‘আজ থেকে মুসলিমান, হিন্দু, স্বীকৃত, বৌদ্ধ রাত্রীয় জীবনে স্ব স্ব ধর্ম পরিচয়ে পরিচিত থাকবে না। তারা সকলেই শুধু জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এক জাতি পাকিস্তানের নাগরিক পাকিস্তানি এবং তারা শুধু পাকিস্তানি হিসেবেই পরিচিত হবে।

সুরঙ্গন আধ শোওয়া থেকে সোজা হয়ে বসে বলে, পাকিস্তানই বোধহয় ভাল ছিল, কি বল?

হায়দার উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে যায়। বলে, আসলে পাকিস্তান ভাল ছিল না মোটেও, পাকিস্তানে তোমাদের আশা করবার কিছু ছিল না। বাংলাদেশে হবার পর তোমরা ভেবেছ এই দেশে তোমাদের সবরকম অধিকার থাকবে, এ হচ্ছে সেকুলার রাষ্ট্র, কিন্তু এই দেশ যখন তোমাদের স্বপ্ন পূরণে বাধা হল, তখন বুকে তোমাদের লাগল বেশি।

সুরঙ্গন খুব জোরে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে বলে শেষ পর্যন্ত তুমি ও বেশ ‘তোমাদের আশা, তোমাদের স্বপ্নটপু’ বলে গেলে। এই ‘তোমরা’ কারা? হিন্দুরা তো? তুমি আমাকেও হিন্দুর দলে ফেললে? এতকাল নাস্তিক্যবাদের বিশ্বাস করে এই লাভ হল আমার?

ভারতে এদিকে মৃত্যের সংখ্যা চারশ’ ছাড়িয়ে গেছে। পুলিশ আটজন মৌলবাদি নেতাকে ফেরতার করেছে। এদের মধ্যে বিজেপির সভাপতির মুরলি মনোহর যোশী আর এলকে আদভানি ও রয়েছে। বাবরি মসজিদ ধর্মসের প্রতিবাদে সারা ভারতে বন্ধ পালিত হয়। বোরে, রাচি, কর্ণটক, মহারাষ্ট্র দাঙা হচ্ছে, মানুষ মরছে।

এদেশের সাম্প্রদায়িক দলতি মুখে বলছে ‘বাবরি মসজিদ ধর্মসের জন্য ভারত সরকার দায়ী। ভারত সরকারের এই দোয়ের জন্য বাংলাদেশের হিন্দুরা দায়ী নয়। বাংলাদেশের হিন্দু ও মন্দিরের বিগ্রহে আমাদের কোনও ক্ষেত্র নেই।’ ইসলামিক চেতনায় উদ্বৃক্ত হয়ে সাম্প্রদায়িক সম্মুতি রক্ষা করতে হবে।’ সাম্প্রদায়িক দলটির এই বক্তব্য টেলিভিশনে ও

সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়। কিন্তু মুখে ওই কথা বললেও বাংলাদেশের মৌলবাদি দল সারা দেশে হরতালের দিন প্রতিবাদ জানানোর নামে যে তাওর চালিয়েছে, যে সন্তাস, তা না দেখলে বিশ্বাস হবার নয়। বাবরি মসজিদ ধর্মসের প্রতিবাদের ছুতোয় একান্তরের ঘাতকেরা নির্মূল কমিটির অফিস ও কমিউনিটি পার্টির অফিসে হামলা এবং ভাঙ্গচুর করেছে, আগুন লাগাচ্ছে। কেন? জামাতে ইসলামির একটি প্রতিনিধিদল বিজেপির নেতাদের সঙ্গে দেখা করেছে। কী কথা হয়েছে তাদের, কী আলোচনা, কী ঘড়্যন্ত সুরঙ্গন তা অনুমান করে। পুরো উপমহাদেশে ধর্মের নামে যে দাসা শুরু হয়েছে, সংখ্যালঘুদের ওপর যে নৃশংস নির্যাতন, সুরঙ্গন নিজে সংখ্যালঘু হয়ে টেরে পায় এই নৃশংসতা কত ভয়াবহ। বসনিয়া হারজেগোবিনার ঘটনার জন্য যেমন বাংলাদেশের কোনও ঐক্ষণ্য নাগরিক দায়ি নয় তেমনি ভারতের কোনও দুর্ঘটনার জন্য বাংলাদেশের হিন্দু নাগরিক দায়ি নয়। এ কথা সুরঙ্গন কাকে বোঝাবে।

সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট শক্তির বিগ্রহে আজ মানববন্ধন। হায়দার বলে, চল চল তৈরি হও, মানববন্ধনে যাব। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও স্বাধীনতা সার্বভৌমত সংরক্ষণে জাতীয় একীক্য ও একান্তরের ঘাতক যুদ্ধাপরাধীসহ সকল সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট শক্তির বিগ্রহে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসেবে এবং সাম্প্রদায়িকতার বিগ্রহে আঞ্চলিক সৌহার্দ্য ও বিশ্বাস্তির লক্ষ্যে বিশ্বামূরতার ঐক্যের প্রতীক হিসেবে জাতীয় সমবয় কমিটির ডাকে সারাদেশে মানববন্ধন।

তাতে আমার কী? সুরঙ্গন প্রশ্ন করে।

তোমার কী মানে? তোমার কিছুই নাঃ হায়দার অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

সুরঙ্গন শাস্তি, হিঁর। বলে, না।

হায়দার এত বিশ্বিত হয় যে সে দাঁড়িয়ে ছিল, বসে পড়ে। হায়দার আবার একটি সিগারেট ধরায়। বলে, এক কাপ চা খাওয়াতে পারো?

সুরঙ্গন বিছানায় লাঘ হয়ে ওয়ে বলে, ঘরে চিনি নেই।

বাহদুর শাহ পার্ক থেকে জাতীয় সংসদ ভবন পর্যন্ত মানববন্ধনের রুট। সকাল এগারোটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত এই রুটে যানবাহন চলাচল বৰ্দ্ধ থাকবে। হায়দার মানববন্ধন সম্পর্কে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, সুরঙ্গন থামিয়ে দিয়ে বলে কাল আওয়াজী লীগের মিটিং এ হাসিনা কি বলল?

শাস্তি সমাবেশে?

হ্যাঁ।

বলল সাম্প্রদায়িক সম্মুতি দত্তাত্রে রাখবার জন্য প্রত্যেক মহল্যায় ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে শাস্তি দ্রিগেড গড়ে তুলতে হবে।

এতে কি হিন্দুরা অর্ধাং আমরা রক্ষা পাব? মানে প্রাণে বাঁচব? হায়দার উত্তর না দিয়ে তাকায় সুরঙ্গনের দিকে। সুরঙ্গন দুদিন শৈতান করেন। চুল উড়েযুড়ে। হঠাৎ প্রসঙ্গ পাট্টায় হায়দার। বলে, মায়া কোথায়? ও জাহানামে গেছে।

সুরঙ্গনের মুখে জাহান্মাম শব্দটি হায়দারকে চমকিত করে। বলে, জাহান্মামটা কিরকম শুনি?

ব্যাখ্যা জানা নেই। এই প্রজন্মের মানুষের মনের গতিপ্রকৃতি আমার দ্বারা বোধা সম্ভব নয়।

বাড়িতে আর কেউ নেই, মেসো মাসিমা কোথায়? অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছ?

বাবার স্ট্রোক হয়েছে।

কি বললে? হায়দার তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। সুরঙ্গন বলে, অস্থির হয়ো না, বাবা একক বছর বাড়িত বেঁচে ছিলেন। তাঁর তো একাত্তরেই মরে যাবার কথা। সেখানে না মরে রীতিমত একক বছর পর স্ট্রোক হওয়ায় এ বেশ বেঁচে যাওয়া নয়!

একাত্তরে কি হয়েছিল?

এবং... রেব বাবা দেনা ছাউনি থেকে ফিরে এসেছিলেন বাড়িতে তাবা যায়?

নিশ্চয় মেরেছে খুব।

বেয়নেটে খুঁচিয়েছে। কাপড়চোপড় খুলে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলিয়ে ছ' ঘন্টা পিটিয়েছে। খুব জলতেষ্টা পেয়েছিল বাবার। ওরা একটি কৌটায় পেছে করে বাবার মুখ হা করিয়ে মুখের মধ্যে ঢেলেছে।

হায়দার মুখ নিচু করে থাকে। জিজেস করে, আর?

সুরঙ্গন চুপ হয়ে থাকে। হায়দার আবার প্রশ্ন করে, আর কি করেছে?

ধৰ একটা দাঁ' দিয়ে পেনিস কেটে দিয়েছে। বলেছে তোর মুসলমানি করে দিলাম, যা। পেনিসের নেই রক্ষণত আর ভাঙা পা নিয়ে তাঃ সুধাময় দণ্ড পালিয়ে বেঁচেছিলেন।

তুমি তো কখনও বলনি।

এসব অবু বলবার কী! আর আমাকেই এই সেদিন মাত্র বলবেন মা।

হায়দার চুপ হয়ে যায় হঠাৎ। ঘরের মধ্যে নিষেকতার আর ধোয়া কুণ্ডী পাকাতে থাকে। এক সময় হায়দারই নীরবতা ভেঙে প্রশ্ন করে—

ভাজার দেখিয়েছে?

তা দেখিয়েছি।

তুম্মি, যেন কেমন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছ সুরঙ্গন। হায়দার দীর্ঘস্থাস ফেলে বলে।

আমি মানববন্দনের জন্য লাফিয়ে উঠলে, যিছিলের আগে শ্রোগান দিয়ে গলা ভাঙলেই তো আমাকে মান্য বেশি, তাই না? বাবার স্ট্রোক হয়েছে এ নিয়েও আমি মাথা ঘূর্মাছি না— এও নিশ্চয় গামাকে অবাক করে।

হায়দার সুরঙ্গনের অনেকদিনের বক্তু। একই বোধ, একই বিশ্বাসের মানুষ তারা। হায়দারের বেনের নাম পারভিন। পারভিনের ওপর যখন পরিবারের বাধা এসেছিল সুরঙ্গনকে তাগ করবার, হায়দার কোন পক্ষে ছিল তা সুরঙ্গনের এখনও জানেই হয়নি। সুরঙ্গন শুনেছে পারভিনের সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারে হায়দার সবসময় নীরব থেকেছে।

নীরব থাকাটা সুরঙ্গনের তখন একদম পছন্দ ছিল না। যে কোনও একপক্ষ নেওয়া তো উচিত। হায়দারের সঙ্গে দীর্ঘ আড়াও হত তখন। পারভিন প্রসঙ্গে কোনও কথা হত না দুজনের মধ্যে। হায়দারই প্রসঙ্গ তুলত না, সুরঙ্গনও না।

আজ অনেকক্ষণ নীরব থেকে হায়দার বলে, পারভিন বোধহয় ডিভোর্স দেবে তার হাজাবেকে। সুরঙ্গন এই জগৎ থেকে বড় বিছিনা চায়, তবু তার বুকের মধ্যে ধৰ করে কিছু নড়ে ওঠে। পারভিন নামটি কি খুব যত্ন করে বুকের সিন্দুরে রাখা, নেপথ্যলিন দিয়ে? বোধহয়। আজ পাঁচ বছর সে পারভিনকে দেখে না। সুরঙ্গনের বুকের তেতরে কষ্ট মোচড় দিয়ে উঠতে চায় কিন্তু সে তা হতে দেয় না, রত্নার মুখটি সে ইচ্ছে করেই মনে করে। রত্না মিত্র। মেয়েটি চমৎকার। সুরঙ্গনের সঙ্গে মানাবেও ভাল। ফর্সা মুখ—কপালে সিন্দুরের টিপ, শাদা সিংথিতে সিন্দুর—প্রতিমার মত লাগবে নিশ্চয়। সুরঙ্গন ধর্ম মানে না তা ঠিক, কিন্তু এই আচার অনুষ্ঠানগুলো, এগুলো সে খুব পালন করতে চায়। উলুধুনি, শালাধুনি, শাখা সিন্দুর এসব কুসংস্কারের প্রতীক হয়ত, কিন্তু এসব পালনে যে বাঙালিতু তা এতদিনে সব সংস্কার ছাপিয়ে উঠেছে। পারভিনকে তো আর শাখা সিন্দুর পরানো যেত না। কিরণময়ী সব বাদ দিয়েছে, দিয়েছে কি শুধু আদর্শের জন্য, দিয়েছে লতিফা শরিফার ক্যাম্পাসেজে বেঁচে থাকবার জন্য—সুরঙ্গনের তাই মনে হয়। সুরঙ্গনকে ঘরের বার করা হায়দারের পক্ষে সভ্য হয় না। হায়দার শেষ অবধি চলে যায়। বাড়ি তার কাছেই, প্রতিবেশি বলা যায়। গণআদালত যেদিন হল, সুরঙ্গনই হায়দারকে ঘূম থেকে তুলে নিয়ে গেছে, গণসমাবেশের দিন বেশ বড়বৃষ্টি ছিল, হায়দার বলেছিল আজ বোধহয় যাওয়া যাবে না। সুরঙ্গন বলেছিল, যাওয়া যাবে না মানে? তৈরি হও তাড়াতাড়ি। এই আমি বসে রইলাম, তোমাকে না নিয়ে যাচ্ছি না। হায়দার অবাক হয়, আজ মানববন্দনের দিন সকাল নটা থেকে এগারোটা অবধি সুরঙ্গনের বাড়িতে কাটিয়ে সুরঙ্গনকে না নিয়ে ফিরতে হবে, একথা সে ভাবতে পারেন।

মায়াকে কিরণময়ী নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছে। এসেই মায়া বাবার ওপর পড়ে হাউমাটি কান্না জুড়ে দিয়েছে। কান্না দেখলে সুরঙ্গনের বড় রাগ ধরে। চোখের জল ফেলে জাগতে কিছু হয়? তার চেয়ে টাকা জোগাড় কর, তাই দিয়ে অসুস্থ মানুষটির জন্য ভাল কিছু যাবার, ফলমূল, ঔষধ কেন, ডাজার দেখাও নিয়মিত। ভাবতে ভাবতে সুরঙ্গনের মনে হয় তার কিছু কাজ করা দরকার। চাঁকির করতে তার ইচ্ছে করে না; কারণ পারেন গোলামি করা। সুরঙ্গনের ধাতে সইবে না। হায়দারের সঙ্গে পুরোনো ব্যবসায় আবার জড়াবে কি না ভাবতে ভাবতে সুরঙ্গনের বড় ফিদে পায়। দুপুর পার হয়ে যায়। তাকে কেউ থেতে ডাকে না। সুধাময়াকে নিয়ে কিরণময়ী আর মায়া ব্যস্ত। সুরঙ্গনের ফিদে গেয়েছে, তার এখন যাবার দরকার এই কথা সে কাকে জানাবে। কিরণময়ীকে? মায়াকে? বাড়িতে কী রান্না হচ্ছে অথবা আদো রান্না হচ্ছে কি না সুরঙ্গন জানে না। এসবের খবর নিতে তার ইচ্ছে করে না। সে কাউকে না বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। কারও বাড়ি

গিয়ে কিছু খেতে হবে তাকে। বিকেল পার হয়ে যাচ্ছে। সুধাময়ের ঘরে সে আজ সারাদিন ঢোকেনি, কিরণময়ী বা মায়াও তার ঘরে আসেনি। অবশ্য দরজা ভেজানো ছিল, ঘরে দুঃস্থী হায়দার ছিল। সম্ভবত ওরা ভেবেছে সুরঙ্গন ঘরে আভড়া দিচ্ছে, এখন যাওয়াটা ঠিক নয়। আর সুরঙ্গন এত আশাই বা করে কেন? কী করেছে সে সংসারের জন্য, কেবল বাইরে বাইরে ঘুরেছে বন্ধুবাক্স নিয়ে, বাড়ির সবার সঙ্গে চিকির চেঁচামেচি করেছে, যে কোনও আনন্দলনে খাঁপিয়ে পড়েছে, পার্টির যে কোনও নির্দেশ বংশবদ্ব ভূতের মত পালন করেছে। গভীর রাতে বাড়ি ফিরে মার্কিস লেনিনের বই মুখ্য করেছে। কী লাভ হয়েছে এতে সুরঙ্গনের? সুরঙ্গনের পরিবারের?

সুরঙ্গন একটি রিঙ্গা নিয়ে পুলকের বাড়িতে যায়। পুলকের ঘরেই পাওয়া যায়। সে আজ চারদিন ঘরবন্দি। বাইরের দরজায় শক্ত তালা দিয়ে ঘরে বসে থাকে। পুলককে প্রথম কথাই সুরঙ্গন বলে—কিছু খাবার দাও, বাড়িতে বোধহয় রান্নাটান্না হয়নি আজ।

মীলা জিজের ঠাণ্ডা ভাত-তরকারি গরম করে টেবিলে দেয়। পুলক জিজেস করে, কেন রান্না হয়নি?

ডাঃ সুধাময় দত্তের স্ট্রোক হয়েছে। তাঁর স্ত্রী এবং কন্যা আপাতত তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত। এককালের ধনাদ্য সুরঙ্গনের পুত্র সুধাময় দত্ত এখন নিজের চিকিৎসার খরচ যোগাতে পারে না।

পুলক বলে, আসলে তোমার চাকরিবাকরি করা উচিত ছিল।

মুসলমানদের দেশে চাকরি পাওয়া খুব কঠিন। আর এই মূর্খদের আভারে কাজ করব কী বল?

পুলক বিশ্বিত হয়, সে সুরঙ্গনের আরও কাছে সরে আসে। জিজেস করে, বল কি সুরঙ্গন! তুমি মুসলমানদের গাল দিছো!

ভয় পাছ কেন, গাল তো তোমার সামনে দিচ্ছি, ওদের সামনে তো আর দিছিন না। সামনে ওদের কি গাল দেওয়া সম্ভব? ধড়ে কি তবে মুরুটি থাকবে?

সুরঙ্গন অক্ষম আক্রমে সোফার হাতলাটি চেপে ধরে। ভাত দেওয়া হয়, সুরঙ্গন খেতে বসে, খেতে খেতে বলে, আমাকে কিছু টাকা ধার দাও পুলক, মেভাবেই হোক।

তা না হয় দেওয়া যাবে। দেশের খবর জান তো? মানিক গঞ্জের, চট্টগ্রামের তোলা টুঙ্গিপাড়ার, শেরপুরের?

এই তো বলবে যে সব মন্দির ভেঙে গুড়িয়ে ফেলেছে। হিন্দুদের ঘর বাড়ি লুট করেছে, পুড়িয়ে দিয়েছে, পুরুষদের মেরেছে, নারীদের ধর্ষণ করেছে— এ ছাড়া আর কোনও মৃত্যু খবর থাকলে বল।

এগুলো তোমার কাছে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে?

নিষ্য স্বাভাবিক, কী আশা কর তুমি এই দেশ থেকে? পিঠ পেতে মেখে বসে থাকবে, আর তারা কিল দিলে গোষ্ঠা করবে, এ তো ঠিক নয়।

পুলক চুপ হয়ে যায়। বলে, তোমার টাকা লাগবে কত?

পাঁচ হাজার। পুলক পাঁচ হাজার টাকা দিতে সামান্য দেরি করে না।

সুরঙ্গন খাওয়া শেষ করে জিজেস করে, অলককে এখনও খেলতে নেয়নি? না। সে সারাদিন মন খারাপ করে ঘরে বসে থাকে।

শেন পুলক, আসলে যাদের ভাবি অসাম্প্রদায়িক, যাদের বক্তু ভাবি, নিজেদের মানুষ ভাবি, যাদের সঙ্গে এমনভাবে মিশছি যে আমরা এখন অনর্গল আসসলামু আলায়কুম বলি, খোদা হাফেজ বলি, জলকে পানি বলি, স্নানকে গোসল বলি, যাদের রমজান মাসে আমরা বাইরে চা সিগারেট খাই না, এমনকি প্রয়োজনে কোনও হোটেল রেতোরায় খেতে পারি না দিনের বেলা, তারা আসলে আমাদের কতটুকু আপন? কাদের জন্য আমাদের এই স্যাক্রিফাইস, বল? পুজোয় কদিন ছুটি পাই, আর দুটো ঈদের মরসুমে তো সরকারি অফিস হাসপাতালগুলোতে ঘাড় ধরে হিন্দুদের দিয়ে কাজ করানো হয়। অষ্টম সংশোধনী হয়ে গেল, আওয়ামী লীগ কদিন চেঁচাল ব্যাস, হাসিনা নিজেই তো এখন মাথা টেকেছে ঘোমটায়। হজ করে আসবার পর চুল দেখা যায় না। এমন ঘোমটাই দিয়েছিল। সবার চরিত্র এক পুলক, সবার। এখন আমাদের সবার হয় আঘাতহ্য। করতে হবে, নয় দেশ ছাড়তে হবে।

সুরঙ্গন টাকা কটি পকেটে নিয়ে চলে যায়। সোজা বাড়ি শিয়ে সে কিরণময়ীর হাতে দেবে টাকা। কিরণময়ী কি করে যে হাল ধরে আছে সংসারে, এই খোজ সুরঙ্গন আগে নেয়নি। সুধাময় অবস্থ হবার পর প্রথম যখন পুত্রের ওপর দায়িত্ব পড়ল, তখনই সে সচেতন হল। অবশ্য দায়িত্ব তাকে কেউ দেয়নি, নিজেই সে অনুভব করেছে। সকলে হয়ত ভেবেছে দেশপ্রেমিক ছেলে, দেশের মঙ্গলচিত্তায় সে দিনরাত না খেয়ে না ঘুমিয়ে পার করেছে, নিজের সুখসুবিধের জন্য বিয়ে পর্যন্ত করেনি, বাবা মা বোনের দিকে নজর দেবার সময় হয় না তার, তাই তাকে আর দায়িত্ব দিয়ে বিরক্ত করবার প্রয়োজন কী। মায়াই বরং টিউশনি বাড়িয়ে দিক। কিরণময়ী নিজে সুধাময়ের বাকি যা টাকা পয়সা আছে, অথবা ধার কর্জ করে হলেও কারও সঙ্গে শলাপরামৰ্শ করে ব্যবসায় খাটাবে, যা আসবে ও থেকে, তাই দিয়ে চলবে। কিরণময়ী একবার বলেছিল ময়মনসিংহে রাইসার্টিন সাহেবের কাছে একবার যাওয়া যায় কি না, এত অল্প টাকায় বাড়িটি নিয়ে নিয়েছেন, এই দুচ্ছসময়ে তিনি যদি কিছু সাহায্য করেন।

সুরঙ্গন কারও কাছে যাবে না। পুলকের কাছে সহজে সে চাইতে পেরেছে, কারণ পুলককে একসময় সে দিয়েছে খুব। আর এবার সে কোনও মুসলমানের কাছে হাত পাতবে না। বাড়ি ফিরবার আগে সুরঙ্গন মনস্থির করে সে রত্নার বাড়ি একবার যাবে, আজিমপুরে। রত্না বাড়িতেই ছিল, অবশ্য বলল সে তিনদিন বাড়িতে ছিল না, পাশেই এক মুসলমানের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। সুরঙ্গনকে সে সাদুর অভ্যর্থনা জানায়। সুরঙ্গন তাবে কোনও ভনিতা না করে সে রত্নাকে বলবে— চলুন আমরা বিয়ে করি।

রত্নার সঙ্গে তার অল্পদিনের পরিচয়। এতে অল্পদিনে হঠাত বিয়ের কথা তোলা শোভন
নয়। তা ছাড়া রত্না জানে সে বেকার একটি ছেলে, এই ছেলেকে বিয়ে করে রত্নারই বা
কী লাভ। সুরঙ্গনের মনে হয় এরা যে কোনও দিন যে কোনও করিম রহিমকে বিয়ে করে
আফরোজা, খালেদা ইত্যাদি নাম ধারণ করবে, আর দিনে পাঁচবার মেঝেয় কপাল টুকরে,
মানে নামাজ পড়বে।

রত্নার বাড়িতে এক কাপ চা পর্যন্ত বসেছে সুরঙ্গন। চা শেষ করেই বলেছে, উঠি।

এত শিগগিরি, তবে এলেন কেন?

দেখতে এলাম অক্ষত আছেন কি না। দরজা খুলে ঢেলে যেতে যেতে সুরঙ্গন বলে।

অক্ষতের তো দুটো অর্থ, কোনটি দেখতে এসেছিলেন?

সুরঙ্গন সিঁড়ির কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভেবে বলে, দুটোই।

সুরঙ্গনের আর বলা হয়নি শেষ পর্যন্ত, চলুন আমরা বিয়ে করি। সুরঙ্গন রত্নার বাড়ি
থেকে বেরিয়ে ভাবে বিয়রই বা কী দরকার জীবনে? বিয়ে হবে, সুরঙ্গনের ঘরে একটি
খাট, একটি টেবিল, টেবিলে গাদাগাদি করে বইপত্র রাখা। ব্যস, ওর মধ্যে রত্নাকে
চুকিয়ে, রত্নার সঙ্গে বিছানায় শয়, ভোরবেলা উঠে, চাকরিবাকরি করে টাকা পয়সা
জমিয়ে ভাল খাওয়াড়োয়া, ভাল একটি বাড়ি ভাড়া করে থাকা, সন্তান জন্ম দিয়ে তাকে
লেখাপড়া শেখানো—কি লাভ এতে? কী লাভ মানুষের বেঁচে থাকায়? এই যে সুধাময়
বেঁচে আছেন খুকে খুকে, তাকে অন্যরা পেছের পায়খানা করাচ্ছে, খাওয়াচ্ছে দাওয়াচ্ছে
কী লাভ তাঁর এরকম বেঁচে থেকে? সুরঙ্গনই বা কেন বেঁচে আছে। একবার ভাবে টাকা
তার প্যাটের পাকেটে, কয়েকটা পেঁথিদিন কিনে একবার পুশ করলে কেমন হয় শিরায়।
মরে যাবে, নির্ধার মরে যাবে। আর মরে গেলে, ধরা যাক বিছানায় সে মরে পড়ে আছে,
বাড়ির কেউ জানল না, ভাবে ঘুমিয়ে আছে ছেলে, তাকে বিরক্ত করা ঠিক নয়। একসময়
মায়া ভাকতে আসবে দাদা। তখন তার দাদা আর সাড়া দেবে না, গা ধরলেই চমকে
উঠবে, কাঠ হয়ে পড়ে আছে দেখে সুরঙ্গনের নিষ্প্রাণ শরীর।

সুরঙ্গন বাড়িতে চুকতে গিয়ে অবাক হয় দরজা হাট করে খোলা। খোলা, এবং ঘরের
জিনিসপত্র সব তচনছ হয়ে আছে। টেবিল উল্টে পড়ে আছে, বইপত্র মাটিতে, বিছানার
তোশক চাদর মাটিতে গড়াচ্ছে। আলানার কাপড়চোপড় ছাড়িয়ে আছে সারা ঘরে।
সুরঙ্গনের শুস বক হয়ে যায়, সে দ্রুত পাশের ঘরে গিয়ে দেখে ও ঘরে একই অবস্থা,
হয়ে শয়ে কাতরাচ্ছে। কিরণময়ী নেই, মায়াও নেই।

বাবা, কী হয়েছে বাড়িতে?

ছেলেছোকরারা এসে এসব করে গেছে, আমাকে একটু দাঢ় করিয়ে দে বাবা,
মায়াকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে, কিরণময়ী পেছন পেছন গেছে। সুরঙ্গন মায়াকে ফিরিয়ে
নিয়ে আয়।

সুধাময়ের কথা জড়িয়ে যায়। সুধাময়কেও মেরেছে নিশচয়, উপুড় হয়ে পড়ে ছিল, না
পারছে হাত পা নাড়াতে না পারছে কাউকে চিন্কার করে ডাকতে। মায়াকে এখন কোথায়
খুঁজবে সুরঙ্গন! রাত সাড়ে দশটা বাজে। দরজা খোলা, সুরঙ্গন হায়দারের বাড়ি যায়, গিয়ে
সোজা বলে, আমাদের মায়াকে দাও।

মানে?

সুরঙ্গনের কথা বলতে কঠ হয়। গলার কাছে আটকে থাকে দল। পাকানো কঠ।
বলে, মায়াকে দিয়ে দাও তোমরা, বলে হঠাত হায়দারকে জাপটে ধরে ডুকরে কেঁদে ওঠে
সুরঙ্গন। হায়দার কিছু বুঝতে পারে না কী হয়েছে সুরঙ্গনের, বাঢ়া ছেলের মত কাঁদছে
কেন? এইমত সে বাড়ি ফিরছে, এখনও কাপড়চোপড় পাল্টানো হয়নি। আজ দলের মিটিং
ছিল, সাপ্রদায়িক সম্প্রতি রক্ষা করতে নেতৃ আহ্বান জানিয়েছেন সকল কর্মীকে।

মায়াকে নিয়ে গেছে, কারা নিয়ে গেছে সুরঙ্গন কিছুই জানে না। সুরঙ্গন কাঁদছে এই
দশ্য হায়দারের চোখে নতুন। হায়দার শুনে অবাক হয়। সুরঙ্গন বলছে মায়াকে দিয়ে দাও
তোমরা, এই তোমরাটা কারা? হায়দার আছে এই দলে? হায়দার বলে, “তোমরা” বলছ
কাদের? আমি নিয়েছি মায়াকে? আমি নিয়েছি? বলে হায়দার সুরঙ্গনের কঁাক্কা খালনো।
সুরঙ্গন মুখ তুলতে পারে না, সে নত হয়, নত হতে হতে সে হায়দারের পারের কাছে
লুটিয়ে পড়ে বলে— মায়াকে এনে দাও এক্সপ্রিস। হায়দার, তুমি পারবে। দয়া করে।

চল দেখি বলে হায়দার বেরিয়ে যায়, পেছন পেছন সুরঙ্গনও দোড়েয়। টিকাটুলির
মত মস্তান, পুরোনো ঢাকার মস্তানদের বাড়িয়ের, আড়তাখানা তম তম করে খোঁজা হয়,
মায়ার খোঁজ পাওয়া যায় না। খানার লোকও নির্বিকার ভাবলেশহীন মুখে ডায়ি করবার
খাতা টেনে নাম লেখে, ব্যাস। রাত চারটে পর্যন্ত খোঁজা হয়। নেই মায়া। রাত প্রায় শেষ
হয় এবং এমন সময় সুরঙ্গন ঘরে ফেরে। লঙ্ঘণ ঘরে বসে কিরণময়ী ব্যাকুল চোখে
তাকিয়ে ছিল দরজার দিকে, সুরঙ্গন মায়াকে নিয়ে ফিরবে এই আশ্বায় সুধাময়ও তার
চেতনাহীন অস নিয়ে নিদাহিন উন্নিপ সময় পার করছিল। না, সুরঙ্গন একা ফেরে, খালি
হাতে। মায়া নেই। সুরঙ্গন ক্লান্ত, ব্যর্থ, নত—মায়াকে ফিরিয়ে আনা তার পক্ষে সতর হয়
না।

কিরণময়ী সিঁটিয়ে আছে। বাড়ির দরজা জানালা সব বন্ধ, বাড়িতে ভেন্টিলেটর নেই,
চোরের মত ঘুপচি ঘরে হাত পা মাথা গুটিয়ে বসে আছে ওরা। সুরঙ্গন কাছে এসে কিছু
পুশ করবার আগে কিরণময়ী বলে, রফিক ছিল ওদের মধ্যে, এই পাড়ারই রফিক। মোড়ে
দাঁড়িয়ে থাকে প্রায়ই দেখি। ওরা সাতজন ছিল মেট।

সুরঙ্গন জিজ্ঞেস করে, কি করল ওরা এসে?

দরজায় খুব জোরে ধাক্কাল। বললাম কে? ওরা বলল মাসিমা খুলুন, কেমন আছেন দেখতে এসেছি। দরজা খুলে দেবার পরই দেখি ওরা হড়মুড় করে আমার গায়ের ওপর এসে পড়ল। ওদের আর বয়স কত, উনিশ বিশ, বড়জোর একুশ বাইশ। ওদের চারজনের হাতে মোটা মোটা লাঠি ছিল, লাঠি দিয়ে ঘরের যা জিনিসপত্র ছিল সব ভেঙে ফেলছে, লাখি মেরে মেরে ফেলল— চেয়ার, টেবিল। টিভিটা ও নিল।

আর?

মায়া আর আমি কুকুড়ে গেছি ভয়ে। ওরা বলল গয়নাগাটি টাকা পয়সা কি আছে, বের কর।

তারপর?

তারপর ঘরে অল্পবল্ল যা সোনার গয়না ছিল, মায়ার বিয়ের জন্য যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম, সেই আমার বিয়ের গয়না, সব নিয়েছে। নিয়ে চলে যাচ্ছে। এমন সময় একজন ঘুরে এসে মায়ার হাত ধরে দিল টান, তোর বাবার বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে পড়ে গেল মেরেয়, গোঙাতে লাগল, আমি মায়াকে টেনে রাখলাম সবটুকু শক্তি দিয়ে। আমি কি আর ওদের সঙ্গে পারিঃ শক্তিতে?

তারপর?

তারপর পেছন পেছন গেছি। নিচে দুটো ক্ষুটার দাঁড়ানো ছিল, মায়াকে টেনে ওরা ক্ষুটারে ওঠায়। ক্ষুটার দুটো সৌ করে চলে যায় আমার চোখের সামনে। মায়ার কান্নার শব্দও আর শোনা যায় না। তারপর?

তারপর বাড়িওয়ালার বাড়িতে কেইন্দে পড়লাম। লোকগুলো শুনল শুধু, চুক চুক করে দুঃখ করল। পাশের ফ্ল্যাটে গেলাম, ওপর তলায়, সবার ওই একই কথা, আহা। সবাই দুঃখ করল কিন্তু কেউ কোনও সাহায্য করল না।

তারপর?

তারপর আর কী বাবা। ফিরে এসে দেখি তোর বাবা বলছে কিরণ ভেব না সুরঞ্জন গেছে মায়াকে আনতে।

দরজা জানলা শক্ত করে বক্ষ করে তিনটে প্রাণী ঘরে বসে আছে। তাদের মেয়ে অপহৃত। সম্ভবত এতক্ষণে তার ওপর গণধর্ষণও সারা। আচ্ছা এরকমও কি হতে পারে না, ছ বছরের মায়া যেমন দুদিন পর বাড়ি ফিরে এসেছিল সেরকম যদি এবারও ও ফিরে আসে। সুরঞ্জনপ্রাণপণে চায় মায়া ফিরে আসুক। ছেটিবেলার মত উদাসীন পায়ে হেঁটে মায়া ফিরে আসুক। এই ছেট, বিধ্বন্ত, সর্বস্বাস্ত সংসারে ও ফিরে আসুক।

হায়দার পৌছে দিয়ে গেছে সুরঞ্জনকে বাড়িতে। বলেছে সুরঞ্জন মন খারাপ করিস না, কাল দেখি কী করা যায়।

হায়দার আশা দিয়েছে। আশা যখন দিয়েছে, সুরঞ্জন কি এই স্থপু দেখতে পারে যে হ্যায়া ফিরবে। একুশ বছর বয়স মায়ার, প্রাণবান এক তরঙ্গী। ওকে কেন ধরে নিয়ে যাবে ওরা, হিন্দু বলে? আর কত ধর্ষণ, কত রক্ত, কত ধনসম্পদের বিনিময়ে হিন্দুদের বেঁচে থাকতে হবে এই দেশে। কচ্ছপের মত মাথা উঁটিয়ে রেখে? কতদিন? সুরঞ্জন জানতে চায় তার নিজের বাছেই, উত্তর নেই। হঠাৎ সুরঞ্জনের বমি পায়, প্রচও ঘুরে ওঠে মাথা, সে গলগল করে বমি করে বাথরুম ভাসিয়ে ফেলে। কিরণময়ী ফিসফিস করে কথা বলে, জোরে কথা বলতেও তার ভয় হয়। বাড়ির বাইরের যে কোনও শব্দেই সে চমকে ওঠে। কিরণময়ী সুধামায়ের দিকে ফিরে তাকায় না। সুরঞ্জনের দিকেও না। সে মেরেয় বসে থাকে, দেওয়ালে পিঠ রেখে, ঘরের এক কোণে। মায়া বেঁচে থাকবার জন্য পার্কলের বাড়ি লুকিয়ে ছিল কদিন, অথচ শেষ রক্ষা হ্যানি, মায়া কি এখন ফেরত আসতে পারবে? এ সমাজে ধর্ষণ আর ঘরণ প্রায় একই, ধর্ষিতা মেয়েদের সুস্থ ও জীবিত মানুষ বলে গণ্য করবার রীতি নেই এখানে। এ বাড়িটি ওরা পুড়িয়ে দিতে পারত, যেহেতু এই বাড়ির মালিক হচ্ছে মুসলমান তাই পোড়ায়নি, নির্বিশ্বে সম্পদ লুটেছে, মেয়েরা তো অনেকটা সম্পদের মত, তাই মায়াকেও লুট করেছে।

ছ' বছর আর একুশ বছর এক নয়। দুবয়সের মেয়েকে ধরে নেবার উদ্দেশ্যও এক নয়। সুরঞ্জন অনুমান করতে পারে একুশ বছর বয়সের একটি মেয়েকে নিয়ে সাতজন পূরুষ কী করতে পারে, মায়ার কি হাতপা বেঁধে নিয়েছে ওরা? মুখে কাপড় ঝুঁজে? সুরঞ্জনের সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে ওঠে ফোভে, যন্ত্রণায়। হায়দার খুঁজেছে ঠিকই, তবু সুরঞ্জনের মনে হয় হায়দার যেন ঠিক তেমন করে যোঁজিনি। মুসলমান দিয়েই মুসলমানদের খুঁজিয়েছে, কাঁটা দিয়ে যেমন কাঁটা তুলতে হয়, তেমন। সুরঞ্জনের হঠাৎ মনে হয়, হায়দার আসলে ভানে মায়াকে কারা নিয়ে গেছে।

ছ' বছর বয়স মায়াকে কেন নিয়েছিল ওরা, রেপ করতে? ব্ল্যাক মেইলিং কিছুই তো করেনি শেষ পর্যন্ত। সুধাময় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলেন মায়াকে, মায়ার শরীরে কেনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না। হিসেবের সংসারে তরতুর করে বেড়ে ওঠা মায়ার জন্য সুরঞ্জন কিছুই করেনি সংস্করণ। থাকে না দাদার কাছে নানারকম আবদার। বেড়াতে নাও, এটা খাব, ওটা পরব। সুরঞ্জন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে সবচেয়ে বেশি। বদ্ধবাদুব, আড়ডা, পাটি— কে মায়া, কে কিরণময়ী, কে সুধাময়, তাদের সুখ দুঃখের কথা শুনে তার দরকার কী। সে এই দেশকে মানুষ বানাবে। সুরঞ্জন তোমার এই দেশ কি আর মানুষ হবে!

হায়দার হয়ত জানে রফিক কে। কোথায় থাকে। হয়ত দেখা যাবে রফিক তার আঘাতীয়। হায়দারের কাছে রফিকের কথা জিজেস করতে হবে, যে করেই হোক এই পাড়ার রফিক ছেলেটিকে তার যোঁজ করতে হবে। হায়দারকে পরদিন ভোরবেলা আবার

ডেকে তোলে সুরঞ্জন। হায়দার বলে রফিক নামে এখানে কাউকে তো আমি চিনি না।
তবু লোক লাগাছি। তুমি বাড়ি চলে যাও, আমার সঙ্গে থাকাটা তোমার ঠিক হবে না।

সুরঞ্জন চলে এল। হায়দারের সঙ্গে থাকা এখন ঠিক হবে না কেন সুরঞ্জন বোকে।
কারণ সুরঞ্জন হিন্দু, হিন্দু হয়ে মুসলমানদের শাস্তি দেওয়া বা ধর্মক দেওয়া ঠিক ভাল ঠেকে
না, সেই মুসলমান চোর হোক কী খুন্নি হোক।

মায়া ফিরিবে নিশ্চয়। যদি মেরে না ফেলে মায়াকে, সকল নির্যাতন শরীরে বহন করে
আপন তিনজন মানুষের কাছে সে ফিরে আসবে নিশ্চয়। টিকটুলির আর তিনটি হিন্দু বাড়ি
লুট হয়েছে। সে রাতেই। সুরঞ্জন বাড়ি ফিরে বালিশে মুখ ডুবিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে
থাকে। সুধাময় খালিক পর পর গোঙাতে থাকেন। সুরঞ্জনের ইচ্ছে করে কিছু বিষ কিনে
এনে তিনজনই খেয়ে মরে যাক। কী দরকার বেঁচে থেকে। কী নিশ্চয়তা আছে এই
দেশে?

কিরণময়ী ও অস্তুত এক মানুষ। সর্বসহা মাটির মত। চবিশ ঘন্টা আগলে রাখছে
সুধাময়কে, এতটুকু ঝুস্তি নেই তার। সুরঞ্জনের কাছে সে কোনও আদেশ অনুরোধও
করে না। যেন তার সব আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবার সুধাময়ই ছিলেন, সুধাময় ছাড়া আর
কারও কাছে তার কোনও প্রত্যাশা নেই। সুধাময় সুস্থ না হয়ে ওঠা অবধি সে নড়বে না।
মায়া? মায়ার জন্য শেষ অবধি সকালের মায়াই হবে, আর কিছু করবার ক্ষমতা তো কারও
নেই। কিরণময়ী গান জানত ভাল, সেই গানের গলা এখন আর নেই। বিয়ের পরও
মহাবলের ফাঁঁশামে গান গাইত। লোকে বলত বেহায়া বেশরম মেয়ে, হিন্দু মেয়েদের
আসলে কোনও লজ্জাশৰম নেই। এইসব কটাক কিরণময়ীকে বড় অস্বাধিতে ফেলত।
নিজেকে সংযত করতে করতে কিরণময়ী পরে গান গাওয়া প্রায় ছেড়েই দিল। সুধাময়ের
কাছে নিজে যেতে সে কিছু চেয়েছে বলে মনে পড়ে না। শাড়ি গয়নার প্রতি কিরণময়ীর
আকর্ষণ ছিল না খুব একটা, সে কখনও এমন আবদার করেনি যে ওই শাড়িটি বা ওই
গয়নাটি চাইই। সুধাময় প্রায়ই বলতেন কিরণময়ী তুমি কখনও কি মনের মধ্যে কোনও
কষ্ট লুকিয়ে রাখ?

কিরণময়ী বলত—না তো!

সুধাময় কিরণময়ীকে আদৰ করে কাছে টেনে বলতেন, আমাকে জানিয়ে তোমার
সব সুখদুঃখ, কেমন। কিরণময়ী হেসে বলত, আমার এই ছেট সংসারেই আমার স্বপ্ন,
সব সুখ যা বল। নিজের জন্য আমি আলাদা কোনও আনন্দ চাই না।

সুধাময়ের বদলির চাকরি, আজ এ জেলায় কাল ও জেলায়। কিরণময়ী দুই সন্তানসহ
থেকেই গেল ব্রাহ্মপুরীর বাড়িতে। সন্তানদের দায়িত্ব তাকেই বেশি বহন করতে হয়েছে।

স্বামীর সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছে থাকলেও সাধ্য ছিল না। আর বিয়ের পর
পাঁচ ছ বছর শুভ্র শাশ্বতির সেবা করতে হয়েছে। কিরণময়ীর বাবা ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার
নামকরা লোক। মেয়ে মেট্রিক পাশ করবার পর সুধাময়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বাবা মা
ভাইরা সব চলে গেলেন কলকাতায়। কিরণময়ীর দুজন মাসত্তো বোন, এক পিসি,
ভাইরা সব চলে গেলেন কলকাতায়। কিরণময়ী ঠাকুরমা ঠাকুরদা, বাবা, মা,
জ্যাঠা, কাকা, বড় পিসি, মাদি, মেসো, দুই মামা মামী এক এক করে চলে গেছেন।
কিরণময়ীর বুকের মধ্যে তীব্র এক হাহাকার ছিল। বড় একা লাগত তার। অবশ্য সুধাময়
তার সব একাকীত্ব দূর করে দিয়েছিলেন, সুধাময় বড় ভালবাসনে এই একা হয়ে যাওয়া
কিরণময়ীকে। তিনি চোরার রোগী দেখে রাতে ঘরে ফিরে কিরণময়ীকে গল্প শোনাতেন,
জান কিরণ আজ অস্তুত এক রোগী এসেছিল, বাচ্চা পেটে, এডভাল স্টেজেও স্বামী তার
পেটে এত জোরে লাথি লাগিয়েছিল যে মেয়েটির জরায় ফেঁটে গিয়েছিল। এই মৃত্যু
থেকে বেঁচে এসেছিল মেয়েটি। আর তারপর সুস্থ হবার পর সে তার স্বামীকে সবার
আগে দেখতে চাইল এমনকি উরু হয়ে স্বামীর পায়ের দুলো পর্যন্ত নিল। কিরণময়ী খুব মন
দিয়ে গল্প শুনত। সুস্থ থাকা তক মন ভাল থাকলে নিজের রোগীর চমকপদ, দুঃখ বা
আনন্দের যে কোনও ঘটনা সুধাময় কিরণময়ীকে বলতেন। সুধাময় চিরকাল উপার্জনের
টাকা কঠি মাসের প্রথম সংগ্রহের কিরণময়ীর হাতে তুলে দিতেন। কিরণময়ীর ওপর বড়
একটি দায়িত্ব ছিল সংসার সুস্থভাবে চালিয়ে নেবার। ঢাকায় আসবার পর কিরণময়ী প্রায়ই
একটি দায়িত্ব ছিল সংসার সুস্থভাবে চালিয়ে নেবার। ঢাকায় আসবার পর কিরণময়ী প্রায়ই
ছিলেন, সুধাময় বলতেন তুমি কাজ করবে কেন, বাড়ির কত বড় দায়িত্ব তোমার ওপর।
সুরঞ্জন সামজতত্ত্বের কথা শিখছে, ওর জন্য একটু ছাড় দিও। লেখাপড়া করুক,
সুরঞ্জন সামজতত্ত্বের কথা শিখছে, ওর জন্য একটু ছাড় দিও। মায়া যেন উচ্ছমে না যায়, দুজনই লেখাপড়া
রাজনীতি ও করুক, আমার আপত্তি নেই। মায়া যেন উচ্ছমে না যায়, দুজনই লেখাপড়া
করে মানুষ হোক। তুমি ওদের দেখো। ভেব না। আমি দুবেলা প্রাকটিস করছি, সংস্কৃত
হলে কাছেই কোনও ফার্মেসীতে বসব। পৃথিবীতে কত মানুষ না খেয়ে থাকে, ফুটপাতে
এসে বলতেন বাসন মাজাটাঙ্গা কিছু থাকলে বল, আমি বেশ ভাল বাসন মাজতে পারি।
কিরণ তোমার চুলে জট পড়েছে, এস জট ছাড়িয়ে দিই। আজ বিকেলে রমনা ভবনে গিয়ে

কিরণময়ী মাঝেমধ্যে ভাবে সুধাময় তাকে খুব ভালবাসেন, সঙ্গে না নিয়ে খেতে
বসেন না। কিরণময়ীর ঘরের কাজগুলো নিজে তিনি প্রায়ই করে দিতেন। রান্নাঘরে প্রায়ই
এসে বলতেন বাসন মাজাটাঙ্গা কিছু থাকলে বল, আমি বেশ ভাল বাসন মাজতে পারি।
কিরণ তোমার চুলে জট পড়েছে, এস জট ছাড়িয়ে দিই। আজ বিকেলে রমনা ভবনে গিয়ে

ভাল দুটো শাড়ি কিনে এন, ঘরে পরবার শাড়ি তোমার কম বোধহয় তাই না? আমার খুব টাকা হলে তোমার নামে বড় একটি বাড়ি বানিয়ে দিতাম ধানমণ্ডিতে, আমি যেন তোমার আগে মরি কিরণ, কিরণ তুমি আমার জীবনে না থাকলে আমি বোধহয় অনেক আগেই মরে যেতাম। কিরণময়ীর শরীরে প্রায়ই বাতের ব্যথা হয়, সুধাময় অনেক রাত জেগে কিরণময়ীর শরীর টিপে দেন। কিরণময়ী মাঝেমধ্যে ভাবে সুধাময় এত তাকে আদর করেন সে কি তাঁর অক্ষমতার জন্য আসলে? একাত্তরে তার পেনিস কেটে নিয়েছিল মিলিটারিয়া, সেই থেকে আজ প্রায় একুশ বছর সুধাময় যৌনজীবন যাপনে সম্পূর্ণ অক্ষম এক মানুষ। এ নিয়ে কিরণময়ীর কাছে তাঁর লজ্জার শেষ নেই। সুধাময় প্রায়ই বলতেন তুমি কি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে কিরণময়ী? চলে যাবার কথা কিরণময়ী কখনও ভাবেন। দুটো স্বতন্ত্র রেখে নিজের শরীরের সুখের জন্য অন্য স্বামীর ঘরে যাবার কথা কিরণময়ী কঢ়নও করে না।

একুশ বছর নিজের কথা কিরণময়ী ভাবেনি, আজই বা ভাববে কেন? মেয়েমানুষের জন্মাই হয় স্বামী সংসারের সেবার জন্য একথা কিরণময়ী মানে না। কিন্তু একথা তার বিশ্বাস হয়, কারও কারও জন্মে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগ করলে খুব একটা ব্যর্থ হয় না জীবন। যদি প্রেমে শ্রদ্ধায় ভালবাসায় বড় কোনও স্বার্থত্যাগ সে করে, যদি এতে তার অন্যরকম এক ত্পৃষ্ঠি হয়, তবে ক্ষতি কি!

8

উত্তর প্রদেশ রাজ্যের অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলবার পর সারা ভারত জুড়ে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল তার মাত্রা কমে আসছে দীরে দীরে। ভারতে মৃতের সংখ্যা এর মধ্যে অঠারোশ ছাড়িয়ে গেছে। কানপুর ও ভূপালে এখনও সংঘর্ষ চলছে। প্রতিবেদে করতে উজ্জ্বর, কর্ণটক, কেরালা, অসম, প্রদেশ, আসাম, রাজস্থান এবং পশ্চিমবঙ্গের রাস্তায় সেনাবাহিনী নেমেছে। তারা টহুল দিচ্ছে। ভারতে নিষিক ঘোষিত দলগুলোর দরজায় তালা পড়েছে। শান্তি ও সম্পূর্ণতার জন্য ঢাকায় সর্বদলীয় স্বতঃকৃত মিছিল হচ্ছে, তাতে কি— ওদিকে সীতাকুণ্ডে মৌলবাদিরা শতাধিক বাড়িগুলি পুড়িয়ে দিয়েছে, লুট করেছে, তিনঘণ্টা ব্যাপী এ অগ্নিকাণ্ডে বারই পাড়ার শতাধিক বাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে মারাত্মক আহত হয়েছে সাধনচন্দ, মনমোহন দাস। দিনাজপুরে প্রায় একশ দোকানপাটের সাইনবোর্ড ভাঙ্চুর করেছে। দশটি মন্দির, চারটি মিষ্টির দোকান লুট হয়েছে। দুপুর দুটো থেকে চারটে পর্যন্ত দুঃস্থিত্বাব্যাপী শহরের বিভিন্ন এলাকায় হামলা চলে। উড়েকালি মন্দিরটি ও ভেঙে ফেলা হয়। পিরোজপুরে এ পর্যন্ত বিশিষ্ট মন্দির ধ্বংস করা হয়, এর মধ্যে তেরটি পিরোজপুর সদরে, পাঁচটি নিসারাবাদে, একটি মঠবাড়িয়া এবং ভাওরিয়ায় একটি। সিরাজগঞ্জে নামাজের পর মিছিল বের হয়, ওরা যোবপাড়া কলিবাড়ি ও হিন্দু বাড়িতে ইটপাটকেল হোঁড়ে। শাজাদপুর থানার একটি মন্দিরে হামলা চালানো হয়, কিছু মৃত্যুহ মন্দিরটি ধ্বংস করা হয়। ছাগলনাইয়ার দাসায় একজন মারাও গেছে, নাম কঞ্জল বিশ্বাস। ছাগলনাইয়া থানার ওতপুর ইউনিয়নের জয়পুর গ্রামে বিশ্বাসবাড়ি, মল্লিকবাড়ি ও ননীবাড়িতে অতর্কিতে হামলা চলে, লুট হয় কিশোরগঞ্জের সিঙ্গেশ্বরী কালিমন্দির ও ভেঙে গুঁড়ে করে ফেলা হয়।

বিরূপাক্ষ শেরপুর থেকে ফিরে বলেছে শেরপুরে একটি মন্দিরও আর আস্ত নেই। সব মাত্রির সঙ্গে মিশে গেছে। এবারের দাস একাত্তরের ভয়াবহতাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

সুরঙ্গন ধর্মক দিয়ে ওঠে, বিরূপ তুমি একে দাঙ্গা বলছ কেন, দাঙ্গা অর্থ জান? দাঙ্গা অর্থ দু দলে মারামারি। এখানে কি দুলে মারামারি হচ্ছে? মারছে তো একদল আরেকে দলকে। এর নাম অত্যাচার বল, নির্যাতন বল।

বিরূপাক মাথা নেড়ে বলে—ঠিক তাই।

সুরঙ্গনের আজ খুব ফ্রেশ লাগছে। সারাদিন ঘর থেকে তার কোথাও বার হবার নেই। হিন্দুরা সব ঘরে লুকিয়ে আছে, সেও লুকিয়ে থাকবে। সাহস দেখিয়ে ঘুরে

বেড়াবার প্রয়োজনটাই বা কী, কী লাভ ওতে, রাত্নাযাটে মেরে ফেলে রাখবে, তখন? মূর্খ লোকের হাতে প্রাণ বিসর্জন দেবে না সুরঞ্জন। সুরঞ্জন আজ সাতদিন পর শ্঵ান করেছে। বাইরে তার ঝুলকালি যা ছিল, দূর হয়েছে। সকাল থেকে অনেকে এসেছে, কাজল দেবনাথ এসেছিলেন, পার্টি অফিস থেকে মতিলাল, মানিক, আফজাল, ফরহাদ এসেছিল, পুলক ও এসেছিল— সকলে জানে মায়া ফেরেনি। মায়া ফেরেনি এই খবর শুনে চুকচুক করে দুঃখ করে গেছে সকলে। ওঘর থেকে খানিক পর পরই মিহি সুরে কান্নার শব্দ ডেনে আসে। কিরণময়ী কাঁদে, সুধাময়ের কান্নায় কোনও শব্দ হয় না। আর সুরঞ্জন এখন হিঁকে করেছে সে কাঁদে না। সে ঠা ঠা করে পাড়া কাঁপিয়ে হাসবে।

প্রতিবেশি গোপালদের বাড়ি লুট হয়েছে, ওদের বাড়ির এক মেয়ে দশ বারো বছর বয়স হবে, বাড়ি এসে সেদিন কিরণময়ীকে বলেছে, মাসিমা আমরা এই বাড়ি ছেড়ে দিছি, আপনাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না। আমরা মিরপুরে বাড়ি নিয়েছি। কিরণময়ী মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, মিরপুরের বাড়ি কি লুট হবে না মা! তবু ভাল থেকে।

মেয়েটি কিছুক্ষণ কথা বলে চলে যায়। সুরঞ্জন শুয়ে শুয়ে মেয়েটিকে দেখে। কাছে ডেকে জিজেস করে, তোমার নাম কি মেয়ে?

মাদল।

তুমি কুলে পড়?

হ্য।

তোমাদের বাড়িতে যখন ওরা ঢুকেছিল, তুমি তখন কি করছিলো?

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডয়ে চিন্কার করে কাঁদছিলাম।

ওরা আমাদের বাড়ির জিনিসপত্র লুট করে যখন চলে যাচ্ছিল তখন কাঁদিস কেন বলে একটা লোক আমার গালে জোরে দুটো চড় মেরেছিল।

আর কিছু করেনি? তোমাকে ধরে নিতে চায়নি?

না।

সুরঞ্জন ভাবে, মায়ার বয়স যদি আরও কিছু কম হত, অথবা আরও কিছু বেশি তবে বোধহ্য ও বেঁচে যেত। ওকে টেনে হিচড়ে কেউ নিত না। হায়দারও আর আসেনি এ বাড়িতে, সুরঞ্জনও যায়নি। হায়দার সম্বৰত রংগে ভঙ্গ দিয়েছে। সুরঞ্জনও বুঝেছে মায়াকে খোজার্জি করা বৃথা, মায়া যদি ফেরত আসে, আসবে। সেই ছ বছর বয়সের মত ফেরত আসবে। তা না হলে প্রকৃতিই জানে অতঃপর এই সংসারের গতি কেন দিকে ঘুরবে।

বদুরা জানিয়ে গেছে ভোলার অবস্থা খুব খারাপ। টুঙ্গিপাড়া থানার পাটগাঁতি, চিংগিরিয়া, কাকুইয়ুনিয়া, নেবুখালি ও বাণুরিয়া গ্রামে মোট নববইটি ঘর আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আফজাল বলেছে টুঙ্গিপাড়া আর শেরপুরে দাসা করিয়েছে বিএনপির এমপিরা। আওয়ামী লীগ পাশ করে এসব জায়গা থেকে, আওয়ামী লীগের ওপর জনগণ যেন আর ভরসা না করে তাই এই যড়মন্ত্র। কারণ রাতে ঘরবাড়ি আগুনে পুড়ে দিমের

বেলা ভাল মানুষ সেজে ওরাই বলে, কোথায় এখন তোমাদের পিয় নেতা? তোমাদের এই বিপদ থেকে তারা তো রক্ষা করছে না। শেখ হাসিনা সর্বদলীয় সমাবেশে বলেছেন স্বাধীনতার একুশ বছর পরও সাপ্তদশায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য আমাদের সমাবেশ করতে হচ্ছে, এটা খুবই দৃঢ়ব্যবস্থাক। সমিলিত সাঙ্কৃতিক জোটের মিছিলে শ্বেগান উঠেছে সাপ্তদশায়িক দাঙ্গাবাজাদের রংবে এবার বাংলাদেশ। আহা বাংলাদেশ। সুরঞ্জন সিংহারেট ফুকতে ফুকতে বাংলাদেশকে বিশ্ব একটা গালি দেয়, বলে শালা ওয়ারের বাচ্চা বাংলাদেশ। গালিটি সে বারবার উচ্চারণ করে। তার বেশ আনন্দ হয়। হেসেও ওঠে হঠাৎ হাসিটিকে নিজের কাছেই বড় কুর মনে হয়।

আজ বিজয় দিবস। সারাদেশ বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান করছে, আলোকসজ্জা করছে, কুচকাওয়াজ করছে। দেশে বেশ আনন্দ হচ্ছে। সুরঞ্জন এই আনন্দের সঙ্গে নিজের অংশগ্রহণ প্রয়োজনীয় মনে করে না। হায়দার এবার আসেনি তাকে নিতে, সম্বৰত ভেবেছে এর বাবার অস্থি, বোন অপহৃত, এ কি আর আনন্দে আগের মত মাতবে, এ এখন বাতিলের খাতায়। হ্যা সুরঞ্জন এখন বাতিলের খাতায়। সে গত দুদিন ঘুমিয়ে কাটিয়েছে, ভেতর ঘরের সঙ্গে যোগাযোগ খুব একটা কারণি। কিরণময়ীর কাছে পুলকের কাছে থেকে আনা পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বলেছে, কাজে লাগিও অবশ্য এ আমার বোজগারের টাকা নয়, ধার করা। কিরণময়ী নিঃশব্দে সুরঞ্জনের টেবিলে দুবেলা খাবার রেখে যায়, সুরঞ্জনের মাঝেমধ্যে রাগও ধরে মানুষটি কি পাথর? তার স্বামী এখন পদ্ম, তার কল্যা হারিয়ে গেছে, পুত্র থেকেও নেই, তার কেন তবু অভিযোগ নেই কারও প্রতি। মৃত মানুষের মত অভিযোগহীন, অনুভবহীন একটি আশ্চর্য নিখর জীবন কিরণময়ীর।

সুরঞ্জন বাত আটকার দিকে আজ বাড়ি থেকে বেরোয়। একটি কাজ করবার উৎসাহ জাগে তার। সে ভাবে সে এই কাজটি আজ করবেই। এই কাজটি না করলে তার শরীরের পতি লোমকৃপে গোপন একটি আগুন জ্বলছে, তা নিভবে না। এই কাজটি না করলে একটি খাসকম্বন্দকৰ জীবন থেকে সে মৃত্যি পাবে না, এই কাজটি হয়ত কোনও সমস্যার সমাধান নয় তবু এই কাজ তাকে স্বত্ত্ব দিবে, এই কাজ করে সে তার ক্ষেত্র, তার ক্ষেত্র, তার যন্ত্রণা কিছুটা হলেও কমাবে।

সুরঞ্জন একটি রিপ্লা নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের দিকে যায়, আজ নগরীতে উৎসব। শাপলা চতুরে এসে ডানে তাকায়, ও পাশেই ইতিয়ার হাইকমিশনের লাইব্রেরি, পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া বইয়ের লাইব্রেরি। সুরঞ্জনের মনও পুড়েছে এবার। সে রিপ্লাকে প্রেসক্লাবের দিকে সোজা যেতে বলে। মায়াকে ফেরত পাওয়ার আশা সুরঞ্জন ছেড়েছে, সুধাময় আর কিরণময়ীকে জানিয়ে দিয়েছে মায়ার আশা যেন তারা না করে। মায়া সত্ত্ব দৃষ্টিনায় মারা গেছে বলেই যেন তারা ভাবে।

তারা কী ভাবছে সুরঞ্জন জানে না। সুধাময়ের সামনে গিয়ে একদময়ের সচল সহকর্ম মানুষের এমন নিঃশব্দ, নির্জন, অসহায় অবস্থা দেখে সুরঞ্জনের সহ্য হতে চায় না। সুরঞ্জন

রিঙ্গাকে বার কাউপিলের মোড়ে থামায়। থামিয়ে সিগারেট ধরায়। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি, হেঁটে হেঁটে একটি মেয়ে আসে, সুরঞ্জন ডাকে, এই।

বলতেই মেয়েটি রিঙ্গার পাশে এসে দাঢ়ায়, হাসে।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কি।

মেয়েটির বয়স উনিশ বিশ হবে। মুখে রঙ মাখিয়েছে, কিন্তু চেহারায় এক ধরনের সারল্য আছে। মেয়েটি হেসে বলে, পিংকি।

পুরো নাম বল।

শামীমা আক্তার।

নাবার নাম?

আবদুল জলিল।

বাড়ি?

ফেনৌ

কি নাম যেন তোমার?

শামীমা।

ঠিক আছে রিঙ্গায় ওঠ। শামীমা রিঙ্গায় ওঠে রিঙ্গাওয়ালাকে টিকাটুলির দিকে যেতে বলে সুরঞ্জন।

শামীমার সঙ্গে সারা রাত্তা সুরঞ্জন আর কোনও কথা বলে না। তার দিকে তাকিয়েও দেখে না। এই যে মেয়েটি গা রেঁয়ে বসেছে, অথবা কথা বলছে, হাসতে হাসতে ঢলে পড়তে চাইছে সুরঞ্জনের গায়ে— সুরঞ্জনকে এসব কিছুই স্পর্শ করছে না। সে খুব মন দিয়ে সিগারেট ফোঁকে। নিজের ঘরটি বাইরে থেকে তালা দিয়ে এসেছে সুরঞ্জন। সদর দরজায় ডাকাডাকি না করে তালা খুলে ঘরে ঢুকে পড়া যায়। সুরঞ্জন ঘরে ঢোকে, পেছনে শামীমাও। সুরঞ্জন আজ যা করছে, সুস্থ মাথায় করছে। সে আজ কোনও রকম নেশা করেনি। তার মষ্টিক কোনও রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা আক্রান্ত হয়নি। ঘরে ঢুকে শামীমা একটু জোরে জোরেই কথা বলতে ওরু করে, সুরঞ্জন তাকে থামিয়ে বলে, চুপ। একটি কথা নয়। একেবারে চুপ।

ওধর থেকে কোনও শব্দ আসে না। সম্ভবত ঘূর্ণিয়ে গেছে ওরা, অবশ্য কান পেতে রাখলে টের পাওয়া যায় সুধাময় গোগাছে। তারা কি বুকতে পেরেছে তাদের মেধাবী পুত্রধন ও বাড়িতে একটি বেশ্যা নিয়ে ঢুকেছে। সুরঞ্জন অবশ্য শামীমাকে কোনও বেশ্যা ভাবছে না। ভাবছে একটি মুসলমান মেয়ে। একটি মুসলমান মেয়েকে তার খুব ইচ্ছে হচ্ছে ধর্ষণ করতে।

শামীমাকে ধর্ষণ করবে সে। স্বেচ্ছ ধর্ষণ। সে ঘরের বাতি নিবেয়ে দেয়। শামীমার শাড়ি কাপড় টেনে খুলে ফেলে, তার ঝাস দ্রুত হয়, ধাক্কা দিয়ে শামীমাকে মাটিতে ফেলে তার ওপর বাঁপিয়ে পড়ে সুরঞ্জন। এর নাম আদর সোহাগ নয়, সুরঞ্জন বুরতে পারে সে অযথাই মেয়েটির চুল ধরে হেঁচকা টান দিছে, সে মেয়েটির বুকের মধ্যে জোরে কামড় বসাচ্ছে, মেয়েটির তলপেটে, পেটে, উরুতে, ধারালো নথের আঁচড় দিছে। মেয়েটিকে

তচনছ করে সুরঞ্জন ধর্ষণ করল। মেয়েটি ও সম্ভবত এমন অভ্যন্তর হিংস্র খন্দের দেখেনি যে তাকে এমন কামড়ে ছেঁড়ে। শামীমা কাপড় চোপড় গুটিয়ে দাঢ়ায়। সুরঞ্জন বড় শান্ত এখন। এই মেয়েটিকে এখন লাখি মেরে বাড়ি থেকে বার করে দিলে তার আনন্দ হবে। তার শ্বাস আবার দ্রুত হয়, সে গলাধাক্কা দিয়ে মেয়েটিকে ঘরের বার করে দেবে ভাবে। তার বারবার মায়াকে মনে পড়ছে, মায়াকে কি ওরা সাতজনই ধর্ষণ করেছে? মায়ার খুব কষ্ট হয়েছে বোধহয়? মায়া খুব চিন্তকার করেছে বোধহয়। মায়ার চিন্তকার কি কেউ শুনতে পায়নি? একটি প্রাণীও নয়? মায়া এই শহরের কোথায় আছে এখন? ছেঁটে একটি শহর অথচ সে জানে না তার পিয়া বোনটি আতঙ্কুড়ে পতিতালয়ে না বৃঙ্গিপার জনে। কোথায় মায়া?

মেয়েটি সম্ভবত ভয় পেয়েছে সুরঞ্জনের আচরণে। কাপড়চোপড় দ্রুত পরে নিয়ে বলে, টাকা দেন।

ব্যবহার এঙ্গুণি বের হ, সুরঞ্জন ধর্মক দেয়।

শামীমা দরজার দিকে এগোয়। সে আবার করণ চোখে তাকায় সুরঞ্জনের দিকে। বলে, দশটা টাকা আইলেও দেন। সুরঞ্জনের সামান্য মায়া হয়। দরিদ্র একটি মেয়ে। সে হ্যাত আজকের টাকা দিয়ে চাল কিনবে, ভাত রেঁধে খাবে। সুরঞ্জন প্যান্টের পকেট থেকে দশটা টাকা শামীমাকে দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করে।

তুই তো মুসলমান, না?

হ্যাঁ।

তোরা তো আবার নাম পাল্টাস। নাম পাল্টাস নি তো।

না।

যা।

শামীমা চলে যায়। সুরঞ্জনের মনে বড় আরাম হয়। সে আবার কোনও দুঃখ করবে না আজ। আজ বিজয়ের দিন, আজ সকলে আনন্দেয়াস করছে। একুশ বছর আগে এই দিনে শাধীনতা এসেছিল, এই দিনে শামীমা আক্তারও এসেছে সুরঞ্জন দন্তের ঘরে। বাহ শাধীনতা বাহ। শামীমাকে একবারও বলা হয়নি তার নাম। তার নাম যে সুরঞ্জন দন্ত একথিতি শামীমাকে বলা উচিত ছিল, তবে শামীমাও টের পেত তাকে আঁচড়ে কামড়ে রক্তাক করেছে যে মানুষ, সে একটি হিন্দু যুবক। হিন্দুরা ও ধর্ষণ করতে জানে, তাদেরও হাত পা মাথা আছে, তাদেরও দাঁতে ধার আছে, তাদের নর্খেও আঁচড় কাটিতে জানে। শামীমা নিতান্তই নিরীহ একটি মেয়ে, তবু তো মুসলমান। মুসলমানের গালে এখন একটু চড় ক্যাতে পারলেও সুরঞ্জনের আনন্দ হয়।

সারারাত কেটে যায় ঘোরে বেঘোরে, সারারাত কেটে যায় সুরঞ্জনের একা, ভৃতুড়ে নিষ্ঠকৃতায়, নিরাপত্তানীতায়, সন্তানের ডানার নিচে সুরঞ্জন একটি ছোট্ট, অতি তুচ্ছ প্রতিশোধ নিতে চায়, পারে না। সারারাত ধরে শামীমা মেয়েটির জন্য তার মায়াই হয়,

করণ্ণা হয়। হিংসে হয় না। রাগও হয় না। যদি নাই হয় তবে আর প্রতিশোধ কিন্দের। তবে তো এ এক ধরনের পরাজয়। সুরঙ্গন কি পরাজিত? সুরঙ্গন তবে পরাজিতই। শামীমাকে সে ঠকাতে পারেনি। কারণ শামীমা এন্টিনেই ঠকে আছে। তার কাছে সজ্ঞাগ আর ধর্ম অলাদা কোনও আচরণ নয়। সুরঙ্গন কুকড়ে যেতে থাকে বিছানায়, যন্ত্রণায় লজ্জায়। গায়ের লেপখানা সে ফেলে দেয় মেবেয়। বিছানার চাদর দলা পাকিয়ে আছে, সুরঙ্গন মহলা তোকেরে ওপর ইঁটুর কাছে মাথা নামিয়ে এনে কুকড়ে শয়ে থাকে। সকাল হয়েছে, এই কথা জানাতে কিরণময়ী দরজায় শব্দ করে। সুরঙ্গন কথা বলে না। তার খুব প্রস্তাবের বেগ হয়। তবু উঠতে ইচ্ছে করে না। কিরণময়ী চা নিয়ে এসে—, সকালে দুকাপ চা বানাতে হয়, এক কাপ সুরঙ্গনের, সুধাময় আর মায়া কখনও চা খায় না, এক কাপ কিরণময়ীর। সুরঙ্গন জানিয়ে দেয় সে চা খাবে না। সে উঠে শান করবে, তার শব্দ যেন গরম জল দেওয়া হয় বাথকর্মে। কিরণময়ী অগত্যা জল গরম করে।

সুরঙ্গন বিছানা ছাড়ে সকাল দশটায়। তার চা নাস্তা ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে থাকে রান্নাঘরে। সে কখন খায়, না খায় কিরণময়ী ও বুঝতে পারে না। সুরঙ্গন নিজের ওপর অত্যাচার করতে ভালবাসে খুব। দেখা যায় কখনও সিগারেট আর চা খেয়ে সারা দিন পার করছে। ভাত স্পর্শ করছে না। এ নিয়ে কিরণময়ী কিছু বলতে এলে সুরঙ্গন সোজা বলে দেয়— আমি এখন বড় হয়েছি। আমি কি করব, কি খাব, কখন খাব, আন্দো খাব কিনা—এই দায়িত্ব তোমার নয়, আমার।

বাড়ির সকলে এ কথা মনে মনে বিশ্বাস করছে মায়া আর ফিরবেনা। কে একজন সেদিন বাড়ি এসে খবর দিয়ে গেছে গেঙারিয়া লোহার পুলের নিচে মায়ার মত একটি মেয়েকে ভেসে থাকতে দেখেছে। থানায় জিডি এন্টি করেছে সুরঙ্গন, সন্দেহের লোক হিসেবে রফিক নামের একটি ছেলের কথা বলেছে। থানার লোকদের দেখে মনে হয়নি একাজে তারা অগ্রসর হবে। কারণ যখন নাম জিজেস করেছিল সুরঙ্গন চটপট বলেছিল, নাম সুরঙ্গন নতুন।

ও। থানার ওপি মুরের দিকে তাকিয়ে ঘাড়খানা ওপর নিচে এমন দোলানেন যে তিনি বুঝে ফেলেছেন এটি কেবলই লেখার দেখা।

সুরঙ্গন সকালে টুথ ব্রাশে পেষ্ট নিয়ে বাইরের বারান্দায় দাঁড়ায়। গতকাল বিজয় দিবস গেল। একসময় এই দিবস পালন করবার প্রস্তুতি একমাস আগে থেকে নেওয়া হত। সুরঙ্গন উদ্বৃত্তি গান গাইত, গণসঙ্গীতের গলা তার ভাল, বেশ ভরাট, গমগম করে। আর এবার তার বিজয় দিবস পালন সবচেয়ে অন্যরকম। সুরঙ্গন গত রাতের বিজয় উদ্যাপনের কথা ভাবছে, এমন সময় দেখে হায়দার ইঁটছে রাস্তায়। সুরঙ্গনকে দেখে সে সম্ভবত স্দুরচারণাত দাঁড়ায়। এগিয়ে আসে। জিজেস করে, কেমন আছ!

সুরঙ্গন দ্বাত মাজাতে মাজাতেই বলে, ভাল। এর পরই মায়ার প্রসন্ন উত্তবার কথা, কিছু হাস্যার সে প্রসঙ্গ তোলে না। সে রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়ায়, বলে গতকাল শিশিরের লোকেরা বাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জোহা হলে যে গণকবরের শৃতিফলক ছিল তা দেখে দিয়েছে।

গলকর্ম মানে? সুরঙ্গন জিজেস করে।

গলকর্ম মানে তৃষ্ণি জানে না? হায়দার অবাক চোখে তাকায় সুরঙ্গনের দিকে।

সুরঙ্গন মাথা মাড়ে, সে জানে না। হায়দার অপমানিত হয়। অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে দুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, একসময় সে বলে, চলি; ও, পারভিন এখন এখানে, ওর ঢিকের হয়ে গেছে।

সুরঙ্গন শোনে, বিনিময়ে কিছু বলে না। পারভিনের ডিভোর্স হওয়াতে তার কোনও কষ্ট নেই না। ব্যরং মনে হয় বেশ হয়েছে, মজা বোৰ। হিন্দুর কাছে বিয়ে দাওনি, মুসলমানের কাছে দিয়েছে, এখন কেমন? পারভিনকে সে মনে মনে একবার রেপ করে। এই সকালে, দ্বাত মাজা অবস্থায় রেপ তেমন স্বাদের হয় না, তবু মনে মনে রেপ-এ স্বাদ থাকে।

শিশিরের লোকেরা গণকবরের শৃতিফলক ভেঙে দিয়েছে, ভেঙে দিক। শিশিরের লোকের কাছে এখন অঞ্চ, অঞ্চ তারা কাজে লাগাচ্ছে, তাদের কে বাধা দেবে। ধীরে ধীরে একদিন তারা ভেঙে ফেলবে অপরাজেয় বাংলা, ধোপার্জিত স্বাধীনতা, ভেঙে ফেলবে সামাজিক বাংলাদেশ, অযাদেবপুরের মুক্তিযোদ্ধা। এতে কে বাধা দেবে। দু একটা মিছিল দিয়ে রাখে। জামাত শিশির যুবকমাত্তের রাজনীতি বক্ষ হোক বলে শ্রোগন উঠে। পাহিদারের বাল্পার নিয়ে বিভিন্ন প্রতিশীল দলগুলো রাস্তায় নেমে চিক্কার করবে। এতে কি হবে সুরঙ্গন মনে মনে বলে কু হবে।

সুধাময় এখন উঠে বসতে পারেন। পেছনে বালিশ রেখে বসে । দহীন বাড়িটির শব্দ শোনেন। সুধাময়ের মনে হয় এ বাড়িতে সবচেয়ে বেশি বেচে থাকবার সাধ ছিল মায়ার। মায়া মালুম খবর পেয়ে নিজেই নিরাপদ জয়গায় চলে গিয়েছিল, আসতে হল সুধাময়ের জন্মাই। সুধাময়ের এই দুর্ঘটনাটি না ঘটলে মায়াকে আসতে হয় না, নির্যোজ ও হতে হয় না। সুরঙ্গনকে অনেকদিন পর কাছে ডাকেন সুধাময়। পাশে বসতে বলেন। বক্ষ জামালকুলোর নিকে তাকিয়ে দীর্ঘস্থান ফেলে বলেন, দরজার জানালা বক্ষ করে থাকতে সত্ত্ব মানা নয়।

সুরঙ্গনের মলবার কিছু থাকে না। সেও উদাসিন তাকিয়ে থাকে শূন্য ট্রলির দিকে, এই ট্রলিকে টেলিশিমাটি ছিল, নিয়ে গেছে। কিরণময়ী গোপনে সোনা জমাত, সম্ভবত শিশিরের না কাজানাটী মালির কাছে কিরণময়ী শিশিরে অল্প অল্প করে কিছু জমিয়ে রাখাই, কাজিমাতে কাজ দেবে ভেবে। কিরণময়ীর যক্ষের ধনে হাত পড়েছে এবার, সম্ভবত সম্মাটকু নিয়ে কামালের বাড়ি উঠেছিল বলে সে যাত্রা রক্ষা পায়। অনশ্ব এ

বাড়ির জিনিসপত্র ঘরের বাইরে বের করে কারা যেন পুড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এবার কিরণময়ীকে শূন্য করে দিয়েছে এদেশের সুযোগ্য সন্তানেরা।

সুধাময় বলেন, তোর জন্য বড় দুষ্পিতা হয়।

কেন?

তোকে না আবার কবে মেরে ফেলে, রাত করে ঘরে ফিরিস। যখন তখন বাইরে বেরিয়ে যাস। কাল হরিপদ এসেছিল, ভোলায় নাকি খুব খারাপ অবস্থা, হাজার হাজার লোক এখন আকাশের নিচে বসে আছে, মাইলের পর মাইল হিন্দু জেলেদের ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। মানিকজ্ঞের একটি মন্দিরও অক্ষত নেই। ধ্রামগুলোর হিন্দুগুর সব পুড়িয়ে দিয়েছে। মেয়েদের অবাধে রেপ করেছে।

সুরঙ্গন হেসে বলে, এসব কি নতুন খবর?

নতুন খবর হ্যাত নয়। কিন্তু তোকে নিয়ে যে ত্য সুরঙ্গন।

আমাকে নিয়েই ত্য? কেন তোমাকে আর মাকে নিয়ে ত্য নেই? তোমরা হিন্দু নও?

আমাদের আর কী করবে?

তোমাদের মুগু কেটে বুড়িগঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে। এখনও চেন নি এ দেশের মানুষকে। হিন্দু পেলেই ওরা নাস্তা করবে, বৃঢ়ো ছেলে মানবে না।

জেনারালাইজ করছিস কেন? এ দেশের মানুষ কি রাস্তায় নামছে না, প্রতিবাদ করছে না, কাগজে তো বিস্তর লেখালেখি ও হচ্ছে।

এসব করে ছাই হবে।

এসবও হচ্ছে ওদের ষড়যন্ত্র। দা কুড়োল নিয়ে নেমেছে একদল। তাদের বিরুদ্ধে হাত উঠিয়ে ক্ষীণ স্বরে শহর প্রদক্ষিণ করলে দাকুড়োলের ধার কিছু করবে? সুরঙ্গন অনুমান করে এই দেশ একদিন ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নামাটি উঠে যাবে, দেশে বিরাজ করবে শরিয়তি আইন, মেয়েরা বোরখা পরে রাস্তায় বেরোবে, টুপিদাঙ্গি পাঞ্জাবিল্লা লোক বেড়ে যাবে দেশে, দেশে কুল কলেজের বদলে শৈল শৈলে বাড়ে মসজিদ মদ্রাসা সংঘ্যালয়দের নীরবে ধ্বংস করে ফেলা হবে। সুরঙ্গন ভেবে শিউরে ওঠে।

সুধাময়ের চুলে একদিন আরও পাক ধরেছে, স্বাস্থ্য প্রায় অর্ধেক নেমে এসেছে। সুধাময় বলতে চান, এখনও তো অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে মানুষ কথা বলছে। এই শক্তিটি কি সব দেশে আছে? প্রতিবাদ করবার অধিকার?

একাত্তর থেকে কুনো ব্যাঙের মত ঘরে বসে আছেন সুধাময়। আন্দোলন দেখলেই প্রতিবাদ-প্রতিশোধের শব্দ শুনলেই ঘরে এসে দরজায় খিল দিতে হয়। কারণ তাঁর বেলা রিক্ষ বেশি। মুসলমানরা অসংকোচে দাবি আদায়ের শ্রেণান দিতে পারে, হিন্দুরা তা পারে না। হিন্দুকে বেশি মারমুখো হতে দেখলে বিঝুক্ষণকি তা সহ্য করবে না। আহমদ

শীর্ষকে মুরাতাদ ঘোষণা করেও বাঁচিয়ে রাখা যায়, কিন্তু সুধাময় একটু উল্টোসিধে কথা মনেছে। কতল হয়ে যেতে হয়। সুধাময় অনেকদিন পর সুরঙ্গনের কাঁধে হাত রেখে বলে, মায়াকে কি কোথাও পাওয়া যাবে না খুঁজে?

আশি না।

কিরণময়ী তো সেই থেকে একটি রাতও ঘুমোয় না। আর ওর সবচেয়ে বেশি চিন্তা এখন তোকে নিয়ে। তোর কিছু হলে....

মারে খেলে মরে যাব। কত লোকই তো মরছে।

মিয়ে চারবেলা নিজের হাতে কিরণময়ী আমার হাত পায়ের এঞ্জারসাইজ করিয়ে ঘোর ফিরিয়ে আনছে। দাঢ়াতে না পারলে ঝোগী দেখাও তো সত্ত্ব নয়। চার মাসের বাড়ি দাঢ়া বাকি। তৃতী একটা চাকরি বাকরি...

আমি পরের গোল্পটি করব না।

সঙ্গীরাটা আসলে..... আমাদের সেই জমিদারিও তো নেই আর। গোলা ভরা ধান, পুরুষ ভরা মাছ, গোয়াল ভরা গরুর স্বাদ আমরা পেয়েছি। তোদের কালে ছিল অভাব দেখলি। আর ঘামের জমিজমা নিরাপত্তার অভাবে কবেই বিক্রি করে ফেলেছিলাম। সেগুলো ধাকলেও তো অস্ত শেষ বয়সে গ্রামে গিয়ে বাকি জীবন পার করা যেত।

সুরঙ্গন ধমকে ওঠে অশিক্ষিতের মত কথা বলছ কেন? গ্রামে গিয়েই বা তুমি বাঁচতে পারবে নাকি? ওখানে মাতবরের লেঠেলুরা তোমার মাথায় বাড়ি দিয়ে সব কেড়ে নিত।

সুরঙ্গন ধমকে ওঠে অশিক্ষিতের মত কথা বলছ কেন? গ্রামে গিয়েই বা তুমি বাঁচতে পারবে নাকি? ওখানে মাতবরের লেঠেলুরা তোমার মাথায় বাড়ি দিয়ে সব কেড়ে নিত।

মেশে কি দু একটা ভাল লোকও নেই সুরঙ্গন?

না নেই।

তৃতী অশাক্ত হতাশায় ভুগছিস।

অশৰা নয়।

কোরা ব্যক্তিকর? এতকাল যে কম্যুনিজমের ওপর লেখাপড়া করলি, আন্দোলন করলি, সামনে সঙ্গে চললি খিললি ওরা ভাল মানুষ নয়?

মা! কেউ যায়। সবাই কম্যুনাল।

আমার মনে হয় তৃতীও কিছু কম্যুনাল হয়ে যাচ্ছিস।

হ্যা হ্যাঁ। এই দেশ অত্যাত সচেতনভাবে আমাকে কম্যুনাল করছে। আমার দোষ মেই।

সামাজিক ঘরেই মনে রাইল সুরঙ্গন। দুপুরের দিকে খালি গায়ে লুঙ্গি পরে ঘুরে বেড়াল মনে মারাম্বা। হঠাৎ রাস্তাঘাটে থেকে একটি ম্যাচ নিয়ে এনে ঘরের সব বই-এর পাতা ছিকে ছিকে আকস লাগিয়ে দিল সুরঙ্গন। সামনে মোড়া পেতে বারান্দায় বসে সেই আকসের মিকে তাকিয়ে রাইল। কিরণময়ী দৌড়ে এসে সে যজ্ঞের সামনে দাঢ়াতেই সুরঙ্গন হেলে বলল, আগন তাপাবে? এস।

কিরণময়ী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে অস্ফুট কঠে বলল, তুই কি পাগল হয়ে গেছিস?
হ্যাঁ মা। অনেকদিন ভাল মানুষ ছিলাম তো, এবার পাগল হচ্ছি। পাগল না হলে মনে
শাস্তি পাওয়া যায় না।

কিরণময়ী দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বইয়ের পর বই পৃষ্ঠে যেতে দেখল। সুধাময়ী
ঘর থেকে টেচালেন, বাবা ধাম, ধাম, এত রংগ কেন তোর? তুই নিজের ক্ষতি করছিস।

সুধাময়ের আদর্শ ধূয়ে সুরঞ্জন আর জল থাবে না। সুধাময়ী এককালের বামপাহী
বিশ্বাসের মানুষ। সুরঞ্জনকেও গড়ে তুলেছিলেন একই ধারায়। সুরঞ্জন এসব এখন আর
বিশ্বাস করে না। সে অনেক বামপাহীকেও তাকে গাল দিতে দেখেছে ‘শালা মালাউন’
বলে। মালাউন শব্দটি সুরঞ্জন ক্ষুল থেকে শব্দে আসছে। ক্লাসের বকুদের সঙ্গে তর্ক
লাগলেই ওরা দু’এক কথার পরই বলত মালাউনের বাচ্চা। সুরঞ্জন যখন ক্লাস সেভেনে
পড়ে, ফারুক নামের এক বকু টিফিন পিরিয়ডে তাকে ডেকে নিয়ে বলছিল, টিফিনবর্সে
আমি খুব মজার একটি খবার এনেছি, আর কাউকে দেব না, তুই আর আমি ছাদের
সিঁড়িতে বসে খাব, কেমন? সুরঞ্জন ঝুঁধুর্ত ছিল না, কিন্তু তার কাছে এই প্রস্তাব মন্দ
লাগেনি। টিফিনবর্স নিয়ে ছাদের সিঁড়িতে উঠে এল ফারুক, পেছনে সুরঞ্জন। ফারুক
বলল, নে। একটি কাবার দিল হাতে। সুরঞ্জন খেল। একটি নিয়ে ফারুকও শেল। খাওয়া
শেষ হবার সঙ্গে ফারুক সজোরে আনন্দধনি দিল—হুরুরে। সে নিচে নেমে
ক্লাসঘরের সকলকে জানিয়ে দিল সুরঞ্জন গুরু খেয়েছে। সকলে হৈ হৈ করে নাচতে
লাগল। সুরঞ্জনকে কেউ চিটি কাটে, কেউ মাথায় চাটি মারে, কেউ জামা ধরে টান
দেয়। সুরঞ্জন লজ্জায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। তার গাল বেয়ে টপ্টপ জল ঝরছিল।

গুরুরমাংস খেয়েছে বলে তার এতটুকু ঘুনি হচ্ছিল না, ঘুনি হচ্ছিল তাকে যিবে
জাস্ত উচ্চাস দেখে। সে খুব বিচ্ছিন্ন বোধ করছিল। মনে হচ্ছিল যেন সে এদের বাইরে।
এই বন্দুরা একরকম মানুষ, আর সে আরেক রকম।

বাড়ি ফিরে সে কী কান্না সুরঞ্জনের! সুধাময়ীকে বলল, বাবা ওরা আমাকে ষড়যন্ত্র করে
গুরুর মাংস খাইয়ে দিয়েছে।

শব্দে সুধাময়ী হেসে বললেন, এর জন্য কাঁদতে হয় নাকি। গুরুর মাংস তো ভাল
খাবার। কালই আমি বাজার থেকে কিনে আনব, দেবিস। সকলে মিলে খাব।

কিরণময়ী রঁঁয়েছিল গুরুর মাংস। সহজে কি ঝাঁধতে চায়, কিরণময়ীকে অর্ধেক রাত
পর্যন্ত সুধাময়ী বুঝিয়েছিলেন যে, এই সব কুসংস্কারের কোনও মানে হয় না। অনেক বড়
বড় মনীয়ী এই সব সংক্রান্ত মানতেন না। সুরঞ্জনের ধীরে ধীরে কেটেছিল ছেটবেলার
লজ্জা, ভয়, ক্ষেত্র, সংক্ষেপ। পরিবারের শিক্ষক ছিলেন সুধাময়। সুরঞ্জনের মনে হয় তার
বাবা অতিমানব গোছের কিছু হবেন। এত সততা, এত সারল্য, এত আদর্শ নিয়ে সমাজে
বেঁচে থাকা যায় না।

বাড়িতে রেডিও টেলিভিশন কিছু নেই। থাকলে সুধাময় অস্তত খবরগুলো শুনতে
পেতেন। রাতে হঠাত হঠাত তিনি দৃশ্যমান দেখেন, দেখেন মায়াকে একটি বাস্ত্রের মধ্যে

কারা যেন লুকিয়ে রেখেছে। মায়া চিৎকার করছে, কাঁদছে। বেচারা মায়া, দেখতে
দেখতে তরতুর করে বড় হয়ে গেল। সে যে বড় হয়ে গেছে, হিন্দু মেয়ে, বড় হয়ে গেলে
হিন্দু মেয়েদের যে নিরাপত্তা দরকার তা মনে পড়েনি সুধাময়ের। তিনি এখন শোক
করতেও ভুলে গেছেন। কিরণময়ীও কথা বলে না, রোবটের মত কাজ করে যায়,
সুধাময়কে খুব খাওয়ায়, ভাত চড়ায়, সে যে জ্যাত একটি মানুষ, সুবিদ্ধংখ ধারণ করে—
এ মনে হয় না। মায়া যে তার মেয়ে ছিল, নিজেও যেন ভুলে গেছে। কিরণময়ী সুধাময়ী
সুরঞ্জন সকলেই এক একটা পাথর হয়ে যাচ্ছে।

সাপ্তদশিক শক্তির হামলায় সারাদেশে আঠাশ হাজার ঘরবাড়ি আড়াই হাজার
লাখিয়াক প্রতিষ্ঠান, এবং সাড়ে তিনি হাজার মন্দির ও উপাসনালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
গোলায়, মানিকগঞ্জে, সীতাকুণ্ড, মীরোবাইরাই, করুবাজার, কুতুবদিয়ায় মোট দু’লক্ষ লোক
স্বল্পকিছু হারিয়ে সহায়সম্বলহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। দু’হাজার চারশ নারী নির্যাতিতা
হয়েছে এবং মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ একশ বিয়লিশ কেটি টাকা।

সুধাময় চৌষট্টিতে শ্রোগান দিয়েছিলেন ‘পূর্ব পাকিস্তান রাখিয়া দাঁড়াও’। সেদিনের
দেহি দাপা বাড়তে পারেনি, শেখ মুজিব এসে থামিয়েছিলেন আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে
আন্দোলন যেন বেশি বাড়তে ন পারে সে জন্যই দাদা বিদ্যমানে সরকার নিজে।
সরাসরিবিরোধী আন্দোলনের জন্য সরকার ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে
কৌশলান্বী মামলা দায়ের করল। সুধাময় ছিলেন মামলার একজন আসামী। সুধাময়ী
অতীত নিয়ে ভাবতে চান না, তবু অতীত এসে চোখের সামনে নগু হয়ে দাঁড়ায়। কী
শেষেই সে এ জীবনে, সব হারানো ছাড়া!

সুধাময়ের হাবাবার ছাড়া কিছু নেই। চোখের সামনে আবারও ভেসে ওঠে ১৯৮৯
সালের কাঁচি ঘটনা। কুমিল্লার দাউদকানি থানার সবাহন থামে গত আটই ফেব্রুয়ারি
মোহনে হিন্দু সম্পদাদের ওপর আশেপাশের ধানের প্রায় চারশতিক লোক অতর্কিতে
হামলা চালায়। দুর্জনকাবিরা ঘোষণা করে— থাকতে হলে তাদের মুসলিমান হতে হবে, তা
মুসলিমে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। তারা খুবি সম্পদাদের প্রতিটি ঘর লুঠ করে আঁশন
লাগিয়ে মন্দির খুলিয়া করে। অনেককে ধরে নিয়ে যায়, চটগ্রামের রাউজান থানার গশি
মামের বৈদ্যবাড়িতে দিনের বেলা বোমা ফাটাচ্ছে। গুলি চালিয়ে প্রায় দেড়শ জন লোক
হামলা চালায়।

তাপু কি তাই? সুধাময়ের আরও মনে পড়ে খুলনার দিঘলিয়া থানার গাজিরহাটে
মারোটি ধানের হিন্দু সম্পদাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চলেছে। তাদের চাবাবাদে বাধা
মেওয়া হয়, মাঠের ফসল ও গুরুচাগল নিয়ে যায়, দোকান লুট করে। টাসইলের
কালিগাঁথি ধানের ধিমুলী ধানের প্রাচীন মন্দিরে ষেতপাথরের শিখ রাধাগোবিন্দ, অনুপূর্ণা
মুঠি ও শালগ্রাম শিলা চূরি হয়। বিগ্রহ উকার হয়নি এবং কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেওয়া
হয়নি। এর আগেও এই মন্দির থেকে অষ্টধাতুনির্মিত নারায়ণ ও রূপার লক্ষ্মীমূর্তি চূরি

হয়েছিল। ভোলার লালমোহন থানার মদনমোহন আখড়ায় নাম সংকীর্তনের সময় সাপ্তদশিক লোকেরা কীর্তনমণ্ডপে হামলা চালায়। তারা মন্দিরে ঢুকে প্রতিমা ভাঙচুর করে। এ তো গেল নিতান্তই ছেট কঠি ঘটনা। এবার যা ঘটেছে তার তুল্য কিছু হতে পারে না। এবার ছেচন্নিশ, পঞ্জাশ, চৌষটি, নববই সব দাসার বড় দাঙ্গা হয়েছে, সুধাময় টের পাছেন।

লোকে বলত আওয়ামী লীগ হিন্দুদের বাঁচাবে। আওয়ামী লীগের ওপরও এখন আর আস্থা রাখতে পারেন না সুধাময়। আইয়ুব খানের শক্রসম্পত্তি আইন আওয়ামী লীগের আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর আবার সংসদে বহাল করেন। নাম বদলে এটি এখন শক্রসম্পত্তি আইন হিসেবে পরিচিত হয়েছে। সুধাময় একথা বিখ্যাস করেন অর্পিত সম্পত্তি আইনটি যতদিন এইদেশে থাকবে ততদিন হিন্দুদের নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন করা হবে।

দেশ জুড়ে যে হিন্দুরা চলে গেছে, তাদের সম্পত্তিকে বলা হয় শক্রের সম্পত্তি। সুধাময় ভাবেন তাঁর কাকা, জোঠা, মামারা কি দেশের শক্র ছিল? এই ঢাকা শহরে জোঠা, মামাদের বড় বড় বাড়িয়ের ছিল, সোনারগাঁওয়ে ছিল, নরসিংহন, কিশোরগঞ্জ, ফরিদপুরে ছিল, এগুলো কেনওটি কলেজ হয়েছে, কোনওটি হয়েছে সরকারি। অফিস। অনিল কাকার বাড়িতে ছেটবেলায় অনেকদিন বেড়াতে এসেছে সুধাময়। অনিল কাকা সুধাময়কে ঘোড়ার গাড়ি চড়াতেন, রামকৃষ্ণ মিশন রোডে মন্ত বড় এক বাড়ি ছিল অনিল কাকার—দশটি ঘোড়া ছিল বাড়িতে। সুধাময় দু'চোখ ভরে অনিল কাকার প্রাচৰ্ম দেখতেন। সুধাময় দণ্ড এখন টিকটুলির একটি দু'ক্ষমের অদ্বিতীয় স্যাতদেন্তে ভাড়াবাড়িতে দিন কাটান, অথচ কাছেই নিজের কাকার বাড়ি এখন সরকারের নামে। অর্পিত সম্পত্তি আইন বদল হয়ে সম্পত্তি উত্তোধিকার অথবা স্বাক্ষরে অর্পিত হলে অনেকে হিন্দুর দুর্দশা ঘৃত। সুধাময় এই প্রস্তাবটি অনেককে করেছিলেন, কাজ হয়নি। জানেন তার এই রেচে থাকবার কোনও অর্থ হয় না। তিনি এখন এই বিছানায় নিঃশব্দে মরে গেলে কারও কোনও ক্ষতি হবে না। বরং নিরস্তর রাতি জাগরণ এবং সেবাশুধূরার দায়িত্ব থেকে বাঁচবে কিরণময়ী। আর সুরঞ্জন, প্রথম মেধার প্রাণবান মানুষটি যে নিজেই বিষহরা মন্ত্রের কাজ করত, সে এখন নিজেই পান করছে বিষ। ও যে কেমন নীল হয়ে যাচ্ছে সুধাময় বোবেন। সুরঞ্জন এ ঘরে কম আসে, কথা কম বলে তবু তার ওপরে নিঃশব্দে শয়ে থাকা, বই পোড়ানো, মুসলমানদের গালাগাল, গভীর রাতে মেয়ে নিয়ে ঘরে ঢোকা, তার সঙ্গে চিংকার করে কথা বলা, বন্দুবস্তিবদের সঙ্গ এতয়েড় করা— সুধাময় বোবেন সুরঞ্জন আসলে অভিমান করেছে খুব। সংসার, সমাজ, রন্ধন সকল কিছুরই ওপর তীব্র অভিমান করে সে নিজেকে পোড়াচ্ছে হীনমন্ত্রার অক আঙ্গনে।

সেদিন মানিকগঞ্জ থেকে সুধাময়ের এক আঝীয় এসেছিল, ননিগোপাল নামে সুধাময়ের এক লাতায়পাতায় দাদা হয়, তার বৌ ললিতা এসেছিল দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে। বলল, সুধাময়দা এই দেশে আর থাকছি না, মেয়ে বড় হয়েছে, বড় ভয় লাগে, কখন কি

হয়। ললিতা মায়ার খবরটি জানত না। সুধাময় জানাননি, কিরণময়ীও মায়া সম্পর্কে টু শব্দ উচ্চারণ করেনি। যেন মায়া আছে, পারলোর বাড়ি, ফিরে আসবে। আসলে বাড়ির সকলের গোপনে গোপনে এই আশা থেকেই গিয়েছে যে, ধর্মিতা নির্যাতিতা ক্ষতিবিক্ষত মায়া একদিন ফিরে আসবে। ললিতা তার বড় মেয়ে অঙ্গলির নিরাপত্তার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে চলে যাবে। কিন্তু সুধাময়ের মাঝেমধ্যে এও মনে হয় চলে গেলে কি কিছু লাভ হবে, এই দেশের রয়ে যাওয়া হিন্দুরা সংখ্যায় যদি আরও কমে যাব তবে ওদের ওপর অত্যাচার আরও বাড়বে। লাভ হবে যে যাবে তার, না কি যাবা থেকে যাবে তাদের? সুধাময় অনুযান করে লাভ কারোর নয়, ক্ষতি সকলের, ক্ষতি দরিদ্রের, ক্ষতি সংখ্যালঘুদের। এতকাল পর সুধাময়ের মনে হয় যে, কিরণময়ীর ওপর তিনি আসলে অন্যায় করেছেন খুব। কিরণময়ী সুন্দরী, শক্তিত, রূচিবান পরিবারের মেয়ে, তাকে ধূংসের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া একটি সংসারে তুকিয়ে পুরো একুশ বছর বাধিত করেছেন। সুধাময় নিজের স্বার্থই বড় করে দেখেছেন, নয়ত তাঁর বলা উচিত ছিল কিরণময়ী তুমি বিয়ে কর, আবার সংসার কর। কিরণময়ী কি চলে যেত? মানুষের মন তো, চলে যেতেও পারত। এই ভয়ে সুধাময় কিরণময়ীর কাছাকাছি থেকেছেন বেশি, বন্ধুবাক্সবকে বাড়িতে খুব একটা ডাকতেন না। কেন ডাকতেন না, সুধাময় তাঁর অসুস্থ শয্যায় নিজের দুর্বলতাকে নিজেই আঙুল তুলে দেখিয়ে দেন, বলেন— সুধাময়, তুম যে নির্বাকুন্ত হয়ে যাচ্ছিলে ক্রমশ, ইচ্ছে করেই হচ্ছিলে, যেন তোমার বাড়িতে তোমার বন্ধুদের আড়তা বসলে কিরণময়ীর আবার কেনও সক্ষম পুরুষকে যদি পছন্দ হয়ে যায়।

কিরণময়ীর জন্য সুধাময়ের ভালবাসা এবং বন্ধন এত তীব্র হয়ে উঠবার পেছনে ছিল স্বার্থপরতা, যেন এই তীব্রতা দেখে কিরণময়ী ভাবে যে এই ভালবাসা ছেড়ে তার কোথাও যাওয়া উচিত নয়। কেবল ভালবাসায় কি মন ভরে? এতকাল পর সুধাময়ের মনে হয় শুধু ভালবাসায় মানুষের মন ভরে না, আরও কিছুর প্রয়োজন হয়।

হায়দারের মা এক সময় খুব আসত এ বাড়িতে। হায়দারের ভাই বৈনরাও আর আসত শক্তিক আহমেদের স্তৰী ছেলেমেয়েরা। কিরণময়ী সামাজিকতা ভাল জানত, পাড়াগড়শি অথবা চেনাপরিচিত কেউ এলে বসাত, চা টা খাওয়াত। দুপুর বা রাত হলে তাত মাছও খাওয়াত। ধীরে ধীরে সুধাময় লক্ষ্য করলেন হায়দারের মা, বৈনরা আর আসে না। শক্তিক সাহেবের বাড়ি থেকেও কেউ অনেকদিন এদিকে পা বাড়ায় না। কিরণময়ী একদিন বলেছিল, শক্তিক আহমেদের স্তৰী আলেয়া বেগম নাকি তাকে বলছিলেন বৌদি আপনাদের কেনও আঘায়টাআঘায় থাকে না ইত্যিয়ায়?

থাকে, আমার প্রায় সব আঘায়ই তো ওখানে। কিরণময়ী বলল।

তবে আর এখানে পড়ে আছেন কেন?

নিজের দেশ তো, তাই।

আলেয়া বেগমও একটু যেন অবাক হয়েছিলেন। কারণ কিরণময়ীরও যে দেশ এটি, তা যেন প্রথম তিনি অনুধাবন করেছিলেন। আলেয়া যত জোর দিয়ে বলেন এটি আমার দেশ, কিরণময়ীকে তত জোর কি মানয়— আলেয়া বোধহয় ভেবেছিলেন এই কথাই। আজ সুধাময়ও ভাবেন আলেয়া আর কিরণময়ী এক নয়। মানুষ হিসেবে এক হলেও এই সমাজ তাদের এক করে দেখছে না। এই সমাজ মৌলবাদিদের দখলে চলে যাচ্ছে দিন দিন।

৫

বিরূপাক্ষ সুরঙ্গনের পার্টির ছেলে। নতুন চুকেছে। বেশ মেধাবী। সুরঙ্গনকে একদিন খুব মনমরা বসে থাকতে দেখে বিরূপাক্ষ বলল— আপনার এত হতাশা কেন সুরঙ্গনদা? আপনি তো আর ধর্ম মানেন না, পুজো করেন না, গরুর মাংস খান, আপনি মুসলমানদের বলেন যে আপনি ও সভিকার হিন্দু নন। অর্ধেক মুসলমান।

আমি যে সভিকার মানুষ, ওদের আপত্তি তো ওখানেই। উগ্র মৌলবাদি হিন্দু ও মসুলমানে কোনও বিরোধ নেই। দেখ না এখনের জামাতের নেতার সঙ্গে ভারতের বিজেপি নেতাদের বন্ধুত্ব। দুই দেশে দুই মৌলবাদি দল ক্ষমতাবান হতে চাইছে। ভারতের দাসার জন্য দায়ি বিজেপি নয়, দায়ী কংগ্রেস একথা তো বায়তুল মোকাবরমের সভায় নিজামি নিজেই বলেছে।

সুরঙ্গন দন্তের আইডিওলজির খৌজ কেউ নেবে না। তার সুরঙ্গন দন্ত নামটির জন্যই তাকে হঠাত মধ্যরাতে খুন করে ফেলে রাখবে, তার বাড়িঘর লুট করবে, তার বোনকে হরণ করবে, তাকে মালাউন, শালা মালু বলে গাল দেবে, এবং তাকে ভাবতে শেখাবে যে তুমি এ দেশের মানুষ নও, তোমার আসল দেশ ইতিয়া। দ্বিজাতিদের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়েছে, সুতরাং ও দেশ তোমার, এ দেশ আমার।

সুরঙ্গন মাট্টার ডিপ্রি পাশ করে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে ইন্টারভিউ দিয়েছিল। সে মাথাটা সামান্য নত করে শুন্দা জানিয়ে চুকেছিল। পরে পরীক্ষকরা নাকি বলেছিলেন, ছেলেটি বড় বেয়াদব, সালাম দেয়নি। সালাম দেয়নি বলে তার চাকরি ও হয়নি। সুরঙ্গনের বড় অভিমান হয়েছিল। হবেই বা না কেন? আসসলামু আলাইকুম তাকে দিতেই হবে কেন? সে যদি শুন্দা জানাবার অন্য কোনও পক্ষতি ব্যবহার করে? বাংলা ভাষায় যদি শুন্দা জাপন করে তবে তো তার ওই দোষই ধরা হবে যে সে আসসলামু আলায়কুম বলেনি। সে ইসলামকে অবমাননা করেছে।

সুরঙ্গনের নিজ দেশে নিজেকে পরবাসী বলে মনে হয়। সে এই দর্মায় বৈষম্যের দেশে ওটিয়ে যেতে থাকে নিজের যুক্তিবুক্তিবেকসহ নিজের ভেতর। সে তার উদারতা, সহিষ্ণুতা ও যুক্তিবাদি মনকে হরতাল, কারফিউ ও সন্ত্বাসের দেশে ক্রমশ সংকুচিত করে আনে, তাকে নিঃশেষ করে আনে, সে তার দরজাজানলা বক করা ঘরে সিগারেটের ধোয়ায় নিশ্বাস নেবার জন্য অমল হাওয়া পায় না। আলো পায় না সূর্যের। যেন ভয়াবহ কোনও মৃত্যুর জন্য ওরা সবাই অপেক্ষা করছে। এখন আর মায়ার জন্য শোক নয়, নিজেকে ভয়িত্তের জন্য শোক করছে সবাই। তারা একা হয়ে যাচ্ছে, চেনা লোকেরা, মুসলমান বন্ধু বা পড়শি আসছে হয়ত অনেকে, কিন্তু কেউই এ কথা বলতে পারছে না, কুঁকড়ে থেক না, তোমরা নির্ভয়ে হাঁটো, হাসো, কাজ কর, ঘুমোও।

কোথায় যেন বাধে। সুরঙ্গন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা একসময় বলত। বলত এদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুনাম রয়েছে। সুরঙ্গন তুলনা করে দেখত ভারতে যত দাঙ্গা হয়, এ দেশে তার কিছুই নয়, সৌদিন হায়দারও একথা বলেছিল, বলেছিল—ভারতে যে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছে, এ দেশে তো তার কিছুই হয়নি। সুরঙ্গন কথাটির প্রতিবাদ করেছে, বলেছে ভারতের সঙ্গে দেশের তুলনা কেন? ভারতে দাঙ্গা হয়েছে, ভারতের মসজিদ মন্দির নিয়ে। কিন্তু এদেশের মানুষ কেন ভারতের পাপের প্রায়শিক্ষণ করবে। আর তুলনাই বা হচ্ছে কেন?

দর্মায় বৈষম্য এই দেশে এত বেশি, তবু কেন বড় বড় নেতারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলে সুরঙ্গন বুঝতে পারে না। জাতীয় সংসদে ১৯৫৪ সালে মোট সদস্য ছিল তিনশ' নয়জন, আর সংখ্যালঘু ছিল বাহাতুর জন। ১৯৯১ সালে মোট সদস্য তিনশ' পঁয়তাল্লিশ জন, আর সংখ্যালঘু হচ্ছে বারো জন। সেনাবাহিনীতে কোনও সংখ্যালঘু ত্রিগোড়িয়ার মেজর জেনারেল নেই। কর্ণেল সন্তুর জনে একজন, লেফটেনেন্ট কর্ণেল চারশ' পঁঠাশ জনে আর্ট জন, মেজর একহাজার জনে চাল্লিশ জন, ক্যাটেন তেরশ' জনে আটজন, সেকেন্ড ফেল্টেনেন্ট নয়শ জনে তিনজন, সিপাহী আশি হাজারে মাত্র পঁচাশ' জন। চাল্লিশ হাজার বিডিআরের মধ্যে হিন্দু মাত্র তিনশ' জন। সচিবালয়ের অবস্থা আরও করণ। কোনও হিন্দু বৌদ্ধ বা ত্রিষ্টান সচিব বা অতিরিক্ত সচিব পদে নেই। যুগ্মসচিব আছেন একশ' চৌতরিশ জনে মাত্র তিন জন, আবগারি ও শুল্ক কর্মকর্তা একশ' বাহাতুর জনে একজন, আয়কর কর্মকর্তা সাড়ে চারশ'র মধ্যে আটজন। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোয় শ্রেণীর কর্মকর্তা ছেলেবুশি হাজার আটশ চুরানবই এর মধ্যে আছে সাড়ে তিনশ' জন। পুলিশ বাহিনীতে আশি হাজার পুলিশের মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু মাত্র দুই হাজার। অতিরিক্ত আইজি কেউ নেই, আইজিও নেই। বাট্টায়ান্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোয় কর্মকর্তা শিক্ষকরা এক ভাগ, কর্মচারী তিন থেকে চার ভাগ। শুমিক এক ভাগেরও নিচে। শুধু তাই

নয়, জনতা ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, শিল্প ব্যাংকে কোনও এম ডি নেই হিন্দু সম্প্রদায়ের। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডাইরেক্টর হিন্দু কেউ নেই, সোনালী ব্যাংক, অঞ্চলী, শিল্প ও কৃষি ব্যাংকের কোনও ডাইরেক্টর হিন্দু নেই। সমাজের সর্বক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের সংখ্যা যদি বৃদ্ধি না পায় তবে সংখ্যালঘুদের মানসিক নিরাপত্তা অর্জন করা খুব কঠিন হবে, শুধু মানসিকই নয়, শারীরিক নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হবে।

রত্নার সঙ্গে অনেকদিন দেখা নেই। রত্না কেমন আছে, রত্না কি সুরঞ্জনকে বিয়ে করতে চাইবে? সুরঞ্জনের বিশ্বাস হয় রত্না একদিন হঠাতে এক বিষণ্ণ বিকেলে সুরঞ্জনদের টিকাটুলির বাড়িতে উপস্থিত হবে, বলবে কেমন জানি খালি খালি লাগে সুরঞ্জন।

সুরঞ্জন চোখ বুজে টের পায় তার ঘর্মাঙ্গ কপালে একটি করতল এসে থামল, স্পর্শ করল। সুরঞ্জনকে কেউ খুব আদর করে স্পর্শ করেনি কখনও, পারভিন ছাড়া। এবার ও এ বাড়িতে আসেনি। মুসলমান ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলে ঝুটকামেলো নেই, তাই ঝুটকামেলাইন জীবন সে বেছে নিয়েছিল, জীবনে যা কিছু ঘটুক, এ কথা তো মিথ্যে নয় যে পারভিন তাকে চুমু খেতে, সে পারভিনকে জড়িয়ে ধরে বলত তুই একটা পাখি, চড়ুই পাখি। পারভিন হেসে গড়িয়ে পড়ত, বলত তুই একটা বানর। কিরণময়ী হঠাতে হঠাতে ঘরে ঢুকে পড়লে দুজনই বিয়ুক্ত হত। কিরণময়ী আশ্চর্য এক মানুষ, সে বিরক্তি প্রকাশ করেনি কখনও। পারভিনকে সে নিজেও বড় মেহে করত। সুরঞ্জন তার পরিচিত আর সব হিন্দু পরিবারের মানসিকতা বিচার করে দেবেছে যে তার পরিবারই ছিল সবচেয়ে বেশি নন-ক্ষুণ্নাল।

রত্না মিত্রের কথা সুরঞ্জন গভীর করে ভাববার প্রস্তুতি নিচ্ছে যখন, তখনই দরজায় টোকা পড়ে, সুরঞ্জন দরজা খুলে দেখে রত্না দাঁড়িয়ে আছে। নিজেকে ওঁচিয়ে বসুন, বসুন বলতেই রত্নার পেছনে সুরঞ্জন লক্ষ্য করে সৌম্যদর্শন এক ভদ্রলোক। রত্না পরিচয় করিয়ে দেয়— ওর নাম হ্যাম্বুন, আমার বৰ।

সুরঞ্জনের বুকের মধ্যে মুহূর্তে একটি সমুদ্র গর্জে ওঠে। ঝড় হয়, ঘূর্ণিঝড়। জীবনের অনেকটা বছর হেলায় হারিয়ে বাকি জীবনে রত্নাকে নিয়ে তার বড় সংসার করবার স্পন্দন ছিল। আর রত্না কি না মুসলমান বৰ নিয়ে হাসতে হাসতে দাঙাকবলিত দেশে বেঁচে থাকবার বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সুরঞ্জন, তার এলোমেলো দরিদ্র ঘরটিতে রত্না এবং তার স্বামীকে বসিয়ে ভাল মানুষের মত এখন ভাল ভাল কথা বলবে, হ্যাম্বুনের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডসেক করবে, চা খেতে দেবে, বলবে আবার আসবেন! না সুরঞ্জন এসব কিছুই করবে না। এসব তার করতে ইচ্ছে করছে না। সে রত্নাকে হঠাতে বলে, আমি খুব জরুরি কাজে এখন বেরোচ্ছি বাইরে, আপনাদের সঙ্গে কথা বলবার সময় আমার নেই। অতিথি দুজনের মুখ অপমানে লাল হয়ে ওঠে। তারা 'দুর্ঘিত' বলে বেরিয়ে যায়। সুরঞ্জন দরজা বন্ধ করে দরজার দিকে পিঠ ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তার

সম্বিধ ফেরে কিরণময়ী ঘরে ঢুকে সুরঞ্জনের টেবিলের পাঁচ হাজার টাকা রেখে যখন বলল, এই টাকার দরকার হবে না। যার কাছ থেকে ধার করেছিস, দিয়ে দিস। ধার শব্দটি তীরের মত এসে বিধল সুরঞ্জনের মনে। সে কিরণময়ী ঝুঁক্ত নির্লিপ্ত মুখের দিকে তাকাল শুধু, কিছু বলল না।

সুরঞ্জনের কোথাও যাবার নেই। পুলকের কাছে এই টাকা কঠি ফেরত দিলে সুরঞ্জন দায়মূল্য হবে। পুলকের কাছেও তার যেতে ইচ্ছে করে না। সুরঞ্জনের হঠাতে এই ঘরে বড় দম বদ্ধ লাগে। সে বারান্দায় কিছুক্ষণ উদাসিন হাঁটে। কিরণময়ী নিঃশব্দে এক কাপ চা রেখে যায়। সুরঞ্জনের টেবিলে সুরঞ্জন খেয়াল করে, কিন্তু চায়ের দিকে হাত বাড়ায় না। সুধাময় অস্বাস্থিতে এপাশ ওপাশ করেন, কিরণময়ী কিরণময়ী বলে ডাকেন। বাড়িটি নিষ্কৃতার জলে ডুবে থাকে। জলের ভেতর দু'একটি জলপোকা যেমন নিঃশব্দে চলে, নিষ্কৃতার মধ্যে বাড়ির তিনটি প্রাণী তেমনি জলপোকার মত হাঁটে, কেউ কাপও পদশব্দ শুনতে পায় না। হঠাতে এই ভৃত্যে নিষ্কৃতা ভেঙে দেয় কিরণময়ী। কোনও কারণ নেই, কিছু নেই, সুরঞ্জনকে সে কিছুক্ষণ আগে এক কাপ চা দিয়েছে— সে কেন্দে ওঠে, তার তীব্র কান্দার শব্দে সুধাময় চকিতে উঠে বসেন, সুরঞ্জন ছুটে আসে কিরণময়ী ঘরের দেওয়ালে মাথা রেখে যখন কাঁদছে, সুরঞ্জনের সাহস হয় না এই কান্দা থামাতে, সুধাময়েরও হয় না। দুজনই হ্যাঁ হয়ে, নত হয়ে এই কান্দার প্রতিটি ঘর এবং হাহাকার উপলব্ধি করে। সুরঞ্জন দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল, কিরণময়ীর কান্দা থামেনি, সুরঞ্জন চেঁচিয়ে বলে, বাবা আমি কাল সারাবাত একটি কথা ভেবেছি, তোমাকে বলবার সাহস পাইছি না, তুমি আমার কথা রাখবে না জানি। তবু তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি আমার কথা রাখ। চল আমরা চলে যাই।

কোথায়? সুধাময় জিজ্ঞেস করেন।

ইতিয়া।

ইতিয়া?

কিরণময়ীর কান্দা ধীরে ধীরে থেমে আসে। দীর্ঘ কান্দার রেশে তার শরীর দুলে দুলে পোকাতে থাকে। সুধাময় শয়ে শয়ে তাঁর কোথায় কত টাকাপ্যসা আছে হিসেব করেছিলেন; কারণ বাড়িটাকে টাকা দিতে হবে, চার মাসের ভাড়া বাকি। সুধাময় কাগজকলাম ওটিয়ে বললেন, ইতিয়া তোর বাবার বাড়ি না তোর দাদার বাড়ি? তোর চৌদ্দ গোটির কার বাড়ি ইতিয়া যে ইতিয়া যাবি?

দেশ ধূয়ে জল খাব বাবা? এই বাড়ি, এই শেকড় কি দিচ্ছে আমাদের? ইতিয়ায় হিস্তুমের বাড়ি। যত নাস্তিকই হই আমরা, যত উদারপন্থী হই, যত বড় মহামানবই হই, লোকে আমাদের হিন্দুই বলবে, মালাউনই বলবে, এই দেশকে যত আপন ভাবব, এই

দেশ তত দূরে সরবে। মানুষকে যত বেশি ভালবাসব, মানুষ তত আমাদের একয়ের
করবে। এদের বিশ্বাস নেই বাবা। তুমি তো অন্তত একশ জন মুসলমান পরিবারকে বিনা
পয়সায় চিকিৎসা কর। এই দুর্যোগের দিনে কয়জন তোমার পক্ষে দাঁড়িয়েছে? এদেশে
কত পাসেন্ট মানু ধর্মীয় বৈয়ম্য দূর করতে চায়? বাবা চল চলে যাই।

সুধাময় বললেন, মায়াকে রক্ষা করা যদি গেল না, কাকে রক্ষা করতে যাব তবে?

নিজেদের। যেটুকু হারিয়েছি, সেটুকুর জন্য শোক করবার জন্য এখানে বসে থাকব?
এই ভয়ংকর নিরাপত্তান্তার মধ্যে? তার চেয়ে চল চলে যাই।

ওখানে কি করব?

ওখানে যা হোক কিছু করব। এখানেই বা কি করছি। খুব কি ভাল আছি আরাম খুব
মুখে?

শেকড়াইন জীবন.....

শেকড় দিয়ে কি করবে? শেকড় দিয়ে যদি কিছু হতই তবে ঘরের দরজা জানালা বক
করে ঘরে বসে থাকতে হয় কেন? সারাজীবন এরকম কুলো ব্যাঙের জীবন কাটাতে হবে।
এরা কথায় কথায় আমাদের বাড়িঘরে হামলা করবার, আমাদের জবাই করে ফেলবার
অভ্যস রওঁ করে ফেলেছে। এরকম ইন্দুরের মত বেঁচে থাকতে আমার লজ্জা হয় বাবা।
চল চলে যাই।

এখন তো অনেকটা শাস্ত হয়েই আসছে পরিস্থিতি।

সব ওপরে ওপরে। ভেতরে হিংস্রতা আছেই, ভেতরে ভয়ংকর দাঁতনখ বের করে
ওরা ফাঁদ পেতে আছে। তুমি ধৃতি ছেড়ে আজ পাজামা পর, কেন পর, কেন তোমার ধৃতি
পরিবার স্বাধীনতা নেই? চল চলে যাই।

না। আমি যাব না। তোর ইচ্ছে হয়, তুই চলে যা।

যাবে না তুমি?

সুধাময় চাপা অর্থচ দৃঢ় কঠে উত্তর দিল— না।

কিরণময়ীর কান্না থেমে গেছে। সে ঝুঁকে আছে একটি রাধাকৃষ্ণের ছবির সামনে।
এর আগে সুরঞ্জন একটি গণশের মূর্তি দেখেছিল ঘরে, কিরণময়ী লুটিয়ে পড়েছিল তার
সামনে। সেই মূর্তি মুসলমানেরা ভেঙে ফেলেছে। গোপনে কোথাও হয়ত কিরণময়ী
রাধাকৃষ্ণের এই ছবিটি রেখেছিল, এখন এটি বের করে সে ঝুঁকে থাকে, ভগবান কৃষ্ণের
কাছে প্রার্থনা করে নিরাপত্তার নির্ভয়তার, নিরঃপত্র জীবনের।

সুরঞ্জন ব্যর্থ হয়, সে জানত সে ব্যর্থ হবে। সুধাময়ের মত কঠিন চরিত্রের মানুষটি
লাখিখাটা খেয়ে মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে। মাটির সাপ বিচ্ছুরা তাকে কামড়াবে, তবু
সে মাটিতেই কামড় দেবে, মাটিতেই মুখ খুবড়ে পড়বে।

সুরঞ্জন আশাহীনতার অন্ধকারে একা একা সাঁতরায়। রাত হয়, রাত গতীর হয়। তার
জন্য এখন পুলক, হায়দার, কামাল, অসীম, লৃৎফর, কাজল— কেউ সহায় নয়। তার জন্য
শেখ রাফক যে সুধাময় ছিলেন, সুধাময়ও অবশিষ্ট নেই আর। সুরঞ্জন একা হয়ে যায়।
মসজিদের আযান ভেনে আসে, একটি দুটি তিনটি চারটি মাইকের আযান একসঙ্গে
মুনিত হয়। সুরঞ্জন ছোটবেলার মুখস্থ করা বিদ্যো বিড় বিড় করে বলে, স্বরে অতে অযু
কর সকালবেলা, স্বরে আতে আযান.....। সারারাত ছটফট করে সুরঞ্জন নিদ্রাহীনতায়,
আর তার মনে পড়ে পঞ্চিমশাই একদল ছাত্রকে বেত সামনে নিয়ে পড়াতেন অযু কর
সকালবেলা.....

শেষ রাতের দিকে ঘুম পায় সুরঙ্গনের। ঘুমের মধ্যে অস্তুত এক দৃঢ়পু দেখে সে। একা একটি নদীর পাড়ে সে হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে দেখে নদীর একটি ঢেউ তাকে নিয়ে যাচ্ছে গভীরে, সে পাকে পড়ছে, তলিয়ে যাচ্ছে। সুরঙ্গনের সারা শরীর ঘামতে থাকে। সে তলিয়ে যেতে থাকে ফুঁসে ওঠা অচেনা জলে। সুরঙ্গনের এমন অস্ত্র সময়ে একটি শাস্তি স্থির হাত সুরঙ্গনকে স্পর্শ করে, জাগায়। সুরঙ্গন ধড়কড় করে উঠে বসে। ভয়ে নীল হয়ে গেছে তার মুখ। পাক খাওয়া জল তাকে ডুবিয়ে নিছিল, বাঁচবার জন্য সে প্রাণপণ চিৎকার করছিল, একটি খড়কুটোও আঁকড়ে ধরবার জন্য যেমন সে হাত বাড়াচ্ছিল স্বপ্নের মধ্যে, সুরঙ্গন তেমন আঁকড়ে ধরে সুধাময়ের হাত। সুধাময় এসে বসেছেন সুরঙ্গনের বিছানায়।

সুধাময় কিরণময়ীর কাঁদে তর রেখে রেখে হেঁটে এসেছেন। অল্প অল্প শক্তি ফিরেছে তার শরীরে। কিরণময়ী সুধাময়কে ধরে রাখে দু'হাতে।

বাবা? সুরঙ্গন আর কোনও কথা বলতে পারে না। একটি বোৰা জিজ্ঞাসা সুরঙ্গনের মুখে। তখন ভোর হচ্ছে। জানালার দুটো তিনটি ছিদ্রপথে আলোর মুখ দেখা যায়। সুধাময় বলেন, সুরঙ্গন চল আমরা চলেই যাই।

অবাক হয়ে সুরঙ্গন জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাব বাবা?

সুধাময় বলেন—ইত্তিয়া।

সুধাময়ের বলতে লজ্জা হয়, তাঁর কঠ কাঁপে, তবু তিনি চলে যাবার কথা বলেন; কারণ এতদিনে তার ভেতরে গড়ে তোলা শক্ত পাহাড়টি ও দিনে দিনে ধসে পড়েছে।